



E-BOOK

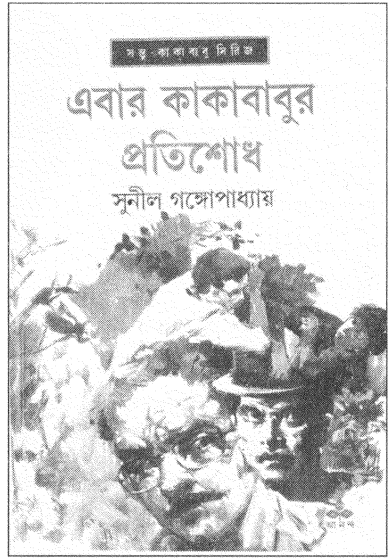
স ভূ - কা কা বা বু সি রি জ

এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



আনন্দ



এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ

সকালবেলা কাকাবাবু দাঁতটাত মেজে বাথরুম থেকে বেরোতেই রঘু ফিসফিস করে বলল, “আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন, নীচের ঘরে বসে আছেন। খুব বড়লোক।” কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, “এত সকালে? তোকে বলেছি না, ন’টার আগে কাউকে ভিতরে বসাবি না?” রঘু বলল, “কী করব, দেখে যে মনে হল ভাইপি! গম্ভীর গলা। এলেবেলে লোক হলে দরজাই খুলতাম না! ইনি খুব দামি সুট পরা।”

রঘু আজকাল মাঝে মাঝেই ইংরেজি শব্দ বলে। তার নিজস্ব উচ্চারণে। আন্দাজে বুঝে নিতে হয়।

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, “দামি সুট দেখেই তুই বুঝে গেলি ভি আই পি? অনেক চোর-ডাকাতও দামি পোশাক পরে! ধুতি কিংবা পাজামা পরা লোক বুঝি ভি আই পি হয় না?”

রঘু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, “আজ্ঞে তাও হয়। এই তো আমাদের শিপ মিনিস্টার ধুতি পরা!”

কাকাবাবু বললেন, “ভি আই পি হোক বা যাই-ই হোক, এখন আমি কথা বলতে পারব না। বলে দে, ন’টার পর আসতো।”

রঘু কাঁচুমাচুভাবে বলল, “স্যার, আপনি তো নীচে নামবেনই, আপনিই বলে দিন না!”

রঘু আগে বলত ‘বাবু’, এখন বলতে চায় ‘স্যার’। কাকাবাবু অনেকবার বারণ করেছেন, স্যার বলতে হবে না, তাও সে শুনবে না।

কাকাবাবু বললেন, “কেন, তুই লোকটিকে ভয় পাচ্ছিস নাকি? ঠিক আছে, যা। চা-টা দিসনি তো? তা হলে আবার দেরি হবে।”

রঘু জিভ কেটে বলল, “আপনার বাথরুম থেকে বের হতে দেরি হচ্ছিল, তাই চা দিয়ে ফেলেছি। বিস্কুটও দিয়েছিলাম, বললেন, ‘লাগবে না!’”

রঘু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু পোশাক বদলাতে লাগলেন।

সারা বাড়িতে আর কেউ জাগেনি। কাল এক বিয়েবাড়িতে বাড়ির সকলের নেমস্তন্ন ছিল, ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। সন্তুষ্ট এখনও ঘুমোচ্ছে, আজ ওর কলেজের ছুটি। যতই রাত জাগুন, কাকাবাবুর ঠিক ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়। রোদ উঠবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। অনেক দিনের অভ্যেস।

নীচে নেমে এসে কাকাবাবু দেখলেন, একজন লোক সোফায় বসে কাগজ পড়ছে।

লোকটির দশসাই চেহারা। লম্বায় ছ’ফিট তিন-চার ইঞ্চি তো হবেই। রঘুর কথামতো, পরনের সুটটা খুব দামি ঠিকই। পায়ের কালো রঙের জুতো এমনই চকচকে পালিশ করা যে, মনে হয়, যেন মুখ দেখা যাবে। গায়ের রং বেশ ফরসা, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, মুখে পুরুষ্টু গোঁফ। প্রথম দেখেই মনে হয়, লোকটি পুলিশ কিংবা আর্মির অফিসার।

কাকাবাবুকে দেখেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “গুড মর্নিং মিস্টার রায়চৌধুরী।”

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, “নমস্কার।”

লোকটির গলার আওয়াজ খুব ভরাট আর গম্ভীর। কিন্তু খুব বিনীতভাবে বলল, “আমি খুব সকালে এসে পড়েছি। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “এই সময় তো আমি কোনও দরকার নিয়ে আলোচনা করি না।”

লোকটি বলল, “আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “বেশি বা কম সময়ের প্রশ্ন নয়, প্রত্যেকদিন আমি মর্নিং ওয়াকে যাই। সেখান থেকে ফেরার আগে আমি কোনও কাজের কথা পছন্দ করি না।”

লোকটি বলল, “মর্নিং ওয়াক খুব ভাল অভ্যেস। আমিও যদি যাই আপনার সঙ্গে? হাঁটতে হাঁটতে আমার কথাটা সেরে নেব।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনি ন’টার পর ঘুরে আসুন না।”

লোকটি বলল, “আমি কাল লেট নাইটে কলকাতায় পৌঁছেছি। আজই

দিল্লি ফিরে যেতে হবে। সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছোতে হবে এয়ারপোর্টে। শুধু আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।”

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “ঠিক আছে। চলুন।”

বাইরে একটা সাদা রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক হোটেলে এই ধরনের গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

লোকটি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কত দূরে যাবেন?”

কাকাবাবু হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “বেশি দূরে না। ওই যে পার্কটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানেই চারপাশে ঘুরি কয়েকবার।”

লোকটি তার গাড়ির ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে বলল, “ঠিক আছে, চলুন, মিস্টার রায়চৌধুরী।”

ক্রাচ বগলে নিয়ে রাস্তায় নেমে কাকাবাবু বললেন, “শুনুন, প্রথমেই বলে রাখি, কোনও চুরি-ডাকাতির ব্যাপার যদি হয়, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারব না। ওসব পুলিশের কাজ।”

লোকটি বলল, “না, না, সেরকম কিছু নয়। কোনও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আমি বিরক্ত করতে আসিনি। আপনি ব্যস্ত মানুষ, আমি জানি।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি এমন কিছু ব্যস্ত নই। মাঝে মাঝে আমি দু’-একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাই বটে, তাও নিজের শখে। টাকার জন্য ডিটেকটিভগিরি করা আমি মোটেও পছন্দ করি না। ওসব আমি পারি না। বেশির ভাগ সময় আমি নিজের ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়তে ভালবাসি।”

লোকটি বলল, “আপনি অনেক বই পড়েন, আপনি খুব জ্ঞানী মানুষ, তাও আমি জানি। আমার অবশ্য বইটাই পড়ার অভ্যেস নেই। নিউজপেপারও পড়ি না। তবে, টিভিতে নিউজ দেখি।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনি বেশ ভালই বাংলা বলছেন। কিন্তু আপনি বাঙালি নন, তাও বুঝতে পারছি। আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কোথায়? কলকাতায় বাড়ি?”

লোকটি বলল, “আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি বাঙালি নই। তবে, আমার বাবা কাজ করতেন কলকাতায়, তখন আমি কলকাতায় থেকেছি। আমার ন’বছর বয়স পর্যন্ত। আমাদের কলকাতায় বাড়ি ছিল ভবানীপুরে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলেছি। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছি। সেই তখনই যে বাংলা শিখেছিলাম, তা ভুলিনি একটুও।

সেই ন'বছর বয়সের পর কলকাতা ছেড়ে যাই। তারপর দু'বার কলকাতায় এসেছি, তাও দু'-একদিনের জন্য মাত্র। এতদিন পরেও বাংলা ঠিক মনে আছে।”

পার্কের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার নামটাই তো এখনও জানা হয়নি।”

লোকটি মুখ নিচু করে বলল, “হ্যাঁ, আমার নাম জানানো হয়নি। নাম বলার একটু অসুবিধে আছে।”

কাকাবাবু থমকে গিয়ে অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, “নাম বলার অসুবিধে আছে? অথচ আপনি আমার সঙ্গে কাজের কথা বলতে এসেছেন?”

লোকটি বলল, “কাজের কথা তো বলতে আসিনি। একটা বিষয় নিয়ে শুধু কথা বলতে এসেছি।”

কাকাবাবু কোনওরকমে বিরক্তি চেপে রেখে বললেন, “কোনও বিষয়টিষয় জানার আগ্রহ আমার নেই। যে লোক নিজের নাম জানায় না, তার কাছ থেকে আমি অন্য কিছু জানতে যাব কেন?”

লোকটি বলল, “আচ্ছা, ধরে নিন, আমার নাম ধ্যানচাঁদ।”

কাকাবাবু আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, “ধরে নেব? কেন, ধরে নিতে যাব কেন? তার মানে, এটা আপনার আসল নাম নয়। ধ্যানচাঁদ তো ছিল এককালের এক বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়ের নাম।”

লোকটি বলল, “ঠিক বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে একটা খেলার বিষয়েই কথা বলতে এসেছি। সেই জন্যই ওই নামটা নিলাম।”

কাকাবাবু এবার বিরক্ত হওয়ার চেয়েও অবাক হলেন বেশি। ভুরু কুঁচকে বললেন, “খেলা? মশাই, আপনি কি আমার সঙ্গে সকালবেলা ইয়ারকি করতে এসেছেন?”

লোকটি এবার গৌঁফের ফাঁকে সামান্য হেসে বলল, “না, ইয়ারকি মোটেই নয়, খুবই সিরিয়াস ব্যাপার! পুরোটা শুনলে বুঝবেন।”

কাকাবাবু বললেন, “আর কিছুই আমি শুনতে চাই না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে! আচ্ছা মিস্টার ধ্যানচাঁদ, আপনি ওসব খেলাটেলার কথা অন্য কাউকে গিয়ে বলুন। আমি এখন একা থাকতে চাই।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “অন্য কারও কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গই ওঠে না। খেলাটা হবে আপনার সঙ্গে আমার।”

কাকাবাবু বললেন, “কী মুশকিল! বললাম না, ছেলেমানুষি খেলাটেলার বয়স আমার নেই।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “ছেলেমানুষি ব্যাপার তো নয়, এটা একেবারেই বড়দের খেলা। আর এ-খেলাটা আপনাকে খেলতেই হবে!”

একটা বকুলগাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে কাকাবাবু বললেন, “কী ব্যাপার বলুন তো? সকালবেলায় এসে আপনি আমায় কী খেলাটেলার কথা বলছেন? আমি তাতে রাজি না হলেও আমাকে খেলতেই হবে কেন? জোর করে আমায় খেলাবেন?”

ধ্যানচাঁদ নিচু গলায় বলল, “জোর করার প্রশ্ন নেই। খেলতে আপনি বাধ্য। নইলে আপনি খুন হয়ে যাবেন! আপনাকে আমি খুন করতে চাইব, আপনি বাঁচার চেষ্টা করবেন, অথবা আমাকে মারতে চাইবেন, এটাই হচ্ছে খেলা। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনাকে খেলতেই হবে।”

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ। কেউ কেউ কাকাবাবুকে রোজই দেখেন বলে হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছেন। বকুলগাছটা থেকে টুপটাপ করে ঝরে যাচ্ছে একটা একটা ফুল। বাতাস বেশ ঠান্ডা। এরই মধ্যে একটা লোক শান্ত গলায় বলল খুন করার কথা!

কাকাবাবু একটুও বিচলিত হলেন না। এর আগেও কয়েকজন তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। একজন তো পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল, তবু বেঁচে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

কাকাবাবু বললেন, “আপনি আমাকে মারতে চাইবেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনিই না। কখনও আগে দেখিনি। তবে কি কখনও না জেনে আপনার কোনও ক্ষতি করেছি?”

ধ্যানচাঁদ বলল, “আপনার রামকুমার পাখির কথা মনে আছে?”

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, “রামকুমার পাখি? এরকম নাম কখনও শুনেছি বলেও মনে হয় না।”

ধ্যানচাঁদ জোর দিয়ে বলল, “হ্যাঁ শুনেছেন। আপনার মনে না-ও থাকতে পারে। শুনেছেন ঠিকই। ভোপালের ভীমবেটকার কথা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই?”

কাকাবাবু বললেন, “ভীমবেটকা? সেটা তো একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক জায়গা। পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে। সেখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। কেন, সেখানে কিছু হয়েছে নাকি?”

ধ্যানচাঁদ বলল, “এখন কিছু হয়নি। তবে, কয়েক বছর আগে সেখানেই এক রান্তিরে আপনি রামকুমার পাধিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।”

কাকাবাবু বললেন, “ও, সেই ডাকাটী? যে তিনজন ইতিহাসের পণ্ডিতকে গলা কেটে খুন করেছিল? ওরে বাবা, সে তো শুনেছি সাংঘাতিক ডাকাত। সেসময় একটা গুজব রটেছিল যে, ভীমবেটকার একটা গুহার মধ্যে প্রচুর গুপ্তধন আছে। সেই গুপ্তধন খোঁজার জন্য প্রচুর লোক নেমে পড়ে, অনেক খুনোখুনি হয়। তারপর...”

ধ্যানচাঁদ বলল, “বাকিটা আমি বলছি। তারপর আপনার বুদ্ধিতেই এক রাতে সকলে ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে ছিল ওই রামকুমার পাধি। যে এক কুখ্যাত ডাকাত।”

কাকাবাবু বললেন, “ওই ডাকাটীকে আমি চিনতাম না। পুলিশ শনাক্ত করেছে।”

ধ্যানচাঁদ জিজ্ঞেস করল, “তারপর সেই ডাকাটীর কী হল?”

কাকাবাবু অস্থির হয়ে বললেন, “সকালবেলা এসে আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করার কী মানে হয়? সে তো পাঁচ-ছ’ বছর আগেকার ব্যাপার, সব চুকেবুকে গিয়েছে। সে ডাকাটীর কী হয়েছে, তা আমি কী করে জানব? তার নামে অনেক কেস ছিল, ফাঁসি হয়েছে নিশ্চয়ই। আমি তো আর সেখানে ডাকাত ধরতে যাইনি, সেটা আমার কাজও নয়। ভীমবেটকায় ইতিহাসের খুব মূল্যবান সব চিহ্ন আছে। গুপ্তধন খোঁজার নামে কেউ যাতে সেগুলো নষ্ট না করে, সেটা আটকাতেই গিয়েছিলাম আমি। তখন যারা ধরা পড়েছে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। আমি আর কিছু জানি না।”

ধ্যানচাঁদ কঠোরভাবে বলল, “মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমি আজীবনে কথা বলতে আসিনি। রামকুমার পাধির ফাঁসি হয়নি, জেলের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল, তা আপনি অবশ্যই জানেন। তখনকার কাগজে আপনার মতামতও ছাপা হয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “ও হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে। সেই ডাকাটী জেলের মধ্যেই আত্মহত্যা করে। আমি বলেছিলাম বটে যে, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আরও অনেক খবর জানা যেত।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “না, মোটেই সে আত্মহত্যা করেনি। তাকে পুলিশরা পিটিয়ে মেরে ফেলে, তারপর তার লাশটা একটা দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। তাতেই বলা হয় যে, সে আত্মহত্যা করেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হতেও পারে। পুলিশরা এরকম কাজ অনেক সময় করে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনি যে আজ খুনোখুনির খেলার কথা বলছেন, তার কী সম্পর্ক বলুন তো? এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।”

ধ্যানচাঁদ এবার কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। সেটা একটা ইংরেজি খবরের কাগজের কাটিং। কাকাবাবুর দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “এটা পড়ুন!”

কাকাবাবু দেখলেন খবরটা। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি শহরে দিনেরবেলা প্রকাশ্য রাস্তায় তিনজন লোক মোটরসাইকেলে চেপে এসে একজন লোককে পরপর ছ’টা গুলিতে ফুঁড়ে দেয়। লোকটি একটা চায়ের দোকানে বসে ছিল। সে কোনও বাধাই দিতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আততায়ীরা পালিয়ে যায়, কেউ তাদের ধরার চেষ্টাও করেনি। মৃত লোকটির পরিচয় জানা গিয়েছে। সে একজন দাগি আসামি। তার নামে অনেক খুন ও ডাকাতির মামলা ঝুলছিল। তার নাম রামকুমার পাধি। তার কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

কাকাবাবু কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ধ্যানচাঁদ বলল, “তারিখটা লক্ষ করেছেন? মাত্র তেইশ দিন আগের ঘটনা। একই লোক কি দু’বার মারা যেতে পারে?”

কাকাবাবু বললেন, “তবে কি ওই ডাকাতটা জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল?”

ধ্যানচাঁদ বলল, “না, মোটেই না! জেলখানাতেই তার মৃত্যু হয়েছিল। সে রেকর্ড আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে কি এক নামে দু’জন লোক? তা তো থাকতেই পারে।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “না, সে ব্যাপারও নয়। এই তেইশ দিন আগে মান্ডিতে যে রামকুমার পাধি মারা গিয়েছে, সেই আসল ডাকাত রামকুমার। তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আর জেলখানার মধ্যে যাকে মারা হয়েছে, তার নাম মোটেই রামকুমার ছিল না। তার নাম ছিল সুরজকান্ত। সে মোটেই ডাকাতও ছিল না। পুলিশ কিছুতেই তা মানতে চায়নি, তাকেই রামকুমার সাজিয়ে অন্যায্যভাবে মেরে ফেলেছে।”

এ-পাড়ারই দুটি ছেলে কাকাবাবুকে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। কাকাবাবু

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নেওয়া পছন্দ করেন না, তা ওরা জানে। তাই হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে একজন জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবু, আপনি এই শনিবার থাকছেন তো? ঠিক আসবেন কিন্তু।”

কাকাবাবু বললেন, “কোথায়? কী আছে শনিবার?”

অন্য ছেলেটি বলল, “আপনার বাড়িতে কার্ড দিয়ে এসেছি। এই শনিবার আমাদের নাটক আছে। আপনি চিফ গেস্ট।”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “নাটকের আবার চিফ গেস্ট কী? ঠিক আছে, সময় পেলে দেখতে যাব, কিন্তু আমি স্টেজে উঠব না।”

ছেলে দুটি আরও কিছু বলতে গেল, কাকাবাবু তাদের কাটিয়ে দিলেন।

ধ্যানচাঁদ অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার সে বলল, “চলুন, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।”

ওঁরা দু’জনেই হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু দু’জনেই চুপ।

আর-একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে কাকাবাবু বললেন, “হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যায় না। হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন, আসল ডাকাতের বদলে পুলিশ সুরজকান্ত নামের একজন নির্দোষ লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তা যদি হয়, সেটা খুবই অন্যায় হয়েছে। এ-বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন তো? পুলিশের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।”

কাকাবাবুর চোখের দিকে চোখ রেখে ধ্যানচাঁদ কেটে কেটে বলল, “সেই সুরজকান্ত আমার ভাই। আমার নিজের ভাই।”

কাকাবাবু একটু চমকে উঠে বললেন, “আপনার ভাই? আমি খুবই দুঃখিত! আমি আপনাকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “আমি কারও সিমপ্যাথি চাই না। আমার ভাই জীবনে কোনও অন্যায় করেনি। পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট ছিল। সে ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করত। সে ভীমবেটকায় কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি, গুপ্তধন খুঁজতেও যায়নি। সে ওখানকার গুহাগুলোতে যে প্রি-হিস্টোরিক আমলের ছবি আছে, সেই সব ছবির একটা লিস্ট তৈরি করার জন্য ভীমবেটকায় প্রায়ই যেত।”

কাকাবাবু বললেন, “গুহার ছবির লিস্ট করার জন্য সে রাত্তিরবেলা যেত? সেখানে তো কোনও আলো ছিল না। পাহাড় আর জঙ্গল!”

ধ্যানচাঁদ বলল, “তার কাজের সুবিধের জন্য সে রাত্তিরবেলা যাবে কি

দিনেরবেলা যাবে, তা সে নিজে ঠিক করবে। কেন, সেখানে রাণ্ডিরে যাওয়ার জন্য কি কোনও নিষেধ ছিল?”

কাকাবাবু বললেন, “না, তা অবশ্য ছিল না। তখন কোনও পাহারাও দেওয়া হত না।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “মোট কথা, আমার ভাই ক্রিমিনাল ছিল না। সেই রাতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সে ধরা পড়ে। পুলিশ তাকে প্রথমেই নটোরিয়াস ক্রিমিনাল রামকুমার পাধি বলে দাগিয়ে দেয়। সে হাজার বার অস্বীকার করেছে, তবু পুলিশ মানেনি। পুলিশ তো অনেক সময় এরকমই করে। কোনও নির্দোষ লোকের ঘাড়ে একটা মিথ্যে দোষ চাপিয়ে তারপর তাকে মেরে ফেলে।”

কাকাবাবু বললেন, “সেই সব পুলিশের বিচার হওয়া উচিত। আপনার ভাইয়ের এরকম মৃত্যুর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত!”

ধ্যানচাঁদ গম্ভীরভাবে বলল, “আপনি শুধু দুঃখিত হলে তো চলবে না। আমার ভাইকে খুন করার জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে!”

কাকাবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, “আপনার ভাইকে আমি খুন করেছি? এ কী অদ্ভুত কথা! শুনুন মিস্টার ধ্যানচাঁদ, আমি জীবনে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু কখনও আত্মরক্ষার জন্যও একটা মানুষ মারিনি। কয়েকবার দু’-একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ক্রিমিনাল একেবারে আমাকে সামনাসামনি মারতে এসেছে, তখনও আমি তাদের বুকে গুলি চালাইনি। হাতে কিংবা পায়ে মেরেছি, তারা কেউ মরেনি। মানুষ মারা আমার কাজ নয়। আপনার ভাইকে তো আমি চিনতামই না, আজই আপনার মুখে তার নাম প্রথম শুনলাম।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “তবু তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনিই দায়ী।”

কাকাবাবু বললেন, “সেই রাতে ভীমবেটকার একটা গুহায় গুপ্তধনের লোভে একদল লোক হামলা করবে, এ-খবর আমি জেনেছিলাম। তাই আমি গ্যাস বোমা ফাটিয়ে সেখানে যারা ছিল, অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম সকলকে। আট-দশ জন, তাদের মধ্যে একজন সাধুও ছিল। পুলিশ অজ্ঞান অবস্থাতেই তাদের তুলে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কে ক্রিমিনাল আর কে নির্দোষ, তা প্রমাণ করা পুলিশের কাজ। আপনার ভাইকে রামকুমার পাধি বলে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। আমি কিছুই বলিনি, আমি কিছু জানতামও না তার সম্পর্কে।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “এ সবই ঠিক, আমি জানি। তবু আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের ফ্যামিলিতে একটা নিয়ম আছে। আমাদের ফ্যামিলির কোনও লোককে যদি কেউ খুন করে, তা হলে সেই খুনিকে কিংবা খুনির ফ্যামিলির কোনও একজনকে না মারতে পারলে আমাদের শাস্তি নেই।”

কাকাবাবু বললেন, “ব্লাড ফর ব্লাড? আরব দেশে এরকম প্রথা ছিল। খুব খারাপ, বর্বর প্রথা। এ ফ্যামিলির একজন অন্য ফ্যামিলির একজনকে খুন করবে, তারপর সেই ফ্যামিলির একজন আবার এ ফ্যামিলির একজনকে, আবার এ ফ্যামিলি থেকে আর-একজন প্রতিশোধ নেবে, এরকম তো চলতেই থাকবে! পরপর খুনোখুনি! এ-যুগে এসব চলে নাকি? এখন আইন-আদালত আছে, বিচারের ব্যবস্থা আছে...”

ধ্যানচাঁদ বলল, “বিচার অনেক সময় ভুল হয়। প্রমাণের অভাবে অনেক ডাকাত কিংবা খুনিও ছাড়া পেয়ে যায়। মিস্টার রায়চৌধুরী, সেই জন্যই তো আমি আপনাকে সব কথা আগে থেকে জানিয়ে রাখছি। আপনাকে আত্মরক্ষার পুরো সুযোগ দিচ্ছি। আমি ভদ্রলোক, আপনাকে কখনও পিছন দিক থেকে এসে মারব না। লড়াই হবে সামনাসামনি। আপনি যদি আমাকে আগেই মেরে দিতে পারেন, তা হলে আর আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের ফ্যামিলি থেকে আর কেউ আপনাকে মারতে আসবে না। লাইক আ স্পোর্টসম্যান, আমরা হার-জিত মেনে নেব। তা হলে কাল থেকে শুরু হোক আমাদের ডেথ-ডেথ খেলা!”

কাকাবাবু এবার চোঁচিয়ে বললেন, “না, আমি রাজি নই! এই ধরনের খেলা খেলে অশিক্ষিত, অসভ্য লোকরা! তা ছাড়া আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমি কোনওভাবেই দায়ী নই!”

ধ্যানচাঁদ বলল, “আপনার পজিশন হচ্ছে নম্বর ত্রি। এক নম্বর দায়ী হচ্ছে সেই পুলিশ অফিসার, যে আমার ভাইয়ের নামে মিথ্যে দোষ চাপিয়েছিল। তার নাম মহিম পাণ্ডে। তার উপরেই প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে গত বছর একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। আর যে-লোকটা জেলের মধ্যে আমার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করেছিল, তার নাম সুলতান আহমেদ। সে আরও কয়েকবার এই কাণ্ড করে যাচ্ছিল, একবার ধরা পড়েছে। সে এখন দশ বছরের জন্য জেল খাটছে!”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে তো তার শাস্তি হয়েছেই!”

ধ্যানচাঁদ বলল, “ও শাস্তির কোনও মানেই হয় না। কোনও পুলিশের লোকের যখন জেল হয়, সে জেলের মধ্যে দিব্যি আরামে থাকে। ভাল খাবারদাবার পায়। অন্য পুলিশরা তাকে সাহায্য করে। ওকে শাস্তি দিতে হলে আমাদের আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। সেই জন্য আমাদের ফ্যামিলির লোকজন ঠিক করেছে, রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য মরতে হবে আপনাকেই।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি মরার জন্য ব্যস্ত নই। অন্য কাউকে মারতেও চাই না! ব্যস, কথা শেষ! গুড বাই!”

ধ্যানচাঁদ বলল, “আমাকেও এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। আর বেশি সময় নেই। মিস্টার রায়চৌধুরী, আমার কথাগুলো হালকাভাবে নেবেন না। এ-খেলা আপনাকে খেলতেই হবে, না হলে আপনার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না কেউ। আজ বারো এপ্রিল। খেলা শুরু কাল থেকে। মে-জুন-জুলাই-অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, এ ছ’মাস চলবে এই খেলা। তার মধ্যে যদি আপনাকে খুন করতে না পারি, তা হলেই খেলা শেষ। তখন আমি হার মেনে নেব। এই খেলায় আপনি অন্য কারও সাহায্য নিতে পারেন, আমারও একজন সহকারী থাকবে। তবে আবার বলে রাখছি, খেলাটা হবে সবসময় সামনাসামনি। পিছন থেকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ একেবারেই না!”

কাকাবাবু বললেন, “রাবিশ! খুনোখুনির নাম খেলা? আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন, এসব বিচ্ছিরি কথা আমি আর শুনতে চাই না! গেট লস্ট!”

ধ্যানচাঁদ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, “গুড বাই। মনে রাখবেন, কাল, তেরো এপ্রিল থেকে ...। এর মধ্যে আপনি কোথাও পালাবার কিংবা লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবেন না। তাতে কোনও লাভ হবে না।”

তারপরই পিছন ফিরে সে হাঁটতে শুরু করল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকাবাবু তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই মনে হয়, লোকটি একসময় আর্মিতে ছিল। পার্কের গেট পেরিয়ে সে বাইরে দাঁড়াতেই সাদা গাড়িটা চলে এল তার কাছে। তাকে নিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল হুশ করে।

কাকাবাবু হাঁটতে শুরু করে ভাবলেন, লোকটি ঠান্ডা মাথায় যেসব কথা বলে গেল, তা কি সত্যি হতে পারে? ওর ভাই সুরজকান্ত মারা গিয়েছে পাঁচ-ছ’ বছর আগে। এতদিন পর তার প্রতিশোধ নিতে এসেছে?

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, “ওর ভাই সুরজকান্তকে আমি মোটেই ধরিয়ে দিইনি। অন্য অনেকের সঙ্গে সে ধরা পড়েছিল। সে দোষী না নির্দোষ, তাও আমি জানি না। অত রাতে সুরকান্ত ভীমবেটকায় গিয়েছিল কেন?”

প্রায় এক ঘণ্টা পার্কে ঘোরাঘুরি করে কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন। রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির দরজার সামনে আসতেই পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা গাড়ি। কলকাতার রাস্তায় কত সাদা গাড়িই তো থাকে। কিন্তু এই গাড়িটা ছুটে আসছে সোজা কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ফুটপাথে উঠে দাঁড়ালেন। গাড়িটা কিন্তু কাকাবাবুকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল না। কাছে এসে থেমে গেল।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল ধ্যানচাঁদ। তার হাতে একটা রিভলভার দেখা যাচ্ছে।

হাসিমুখে ধ্যানচাঁদ বলল, “দেখছেন তো মিস্টার রায়চৌধুরী, এই মুহূর্তে আমি গুলি চালিয়ে আপনাকে ঝাঁঝরা করে দিতে পারতাম। কেউ আমাকে ধরতে পারত না। দিচ্ছি না কেন বলুন তো? কারণ, আমাদের খেলা শুরু হবে কাল থেকে। আমি ভদ্রলোক, কথা রাখি। মনে রাখবেন, আমি এ-কথাও দিয়েছি, ছ’মাসের মধ্যে আপনাকে আমি খুন করবই।”

কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল।

উপরে উঠে এসে কাকাবাবু হাঁক দিয়ে বললেন, “রঘু, আমায় কফি দে!”

তিনখানা খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখা আছে ছোট গোল টেবিলটার উপরে। কাকাবাবু রকিং চেয়ারে বসে পড়ে একটা কাগজ খুললেন। কিন্তু কাগজ পড়ায় তাঁর মন বসল না। শুধু মনে পড়ছে ওই লোকটার কথা। সকালবেলা ওই লোকটা একটা রিভলভার দেখিয়ে শাসিয়ে গেল? কাকাবাবু মরতে ভয় পান না। এর আগে কতবার তিনি কতরকম বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, যখন-তখন মরে যেতে পারতেন। ভয় থাকলে তো তিনি ওইসব বিপদের মধ্যে যেতেনই না। বাড়িতে বসে থাকতেন। খোঁড়া পা নিয়েও তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে দৌড়েছেন কতবার। কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছেন। একদিন না-একদিন তো সব মানুষেরই মৃত্যু হয়। তা বলে একজনের সঙ্গে জোর করে খুনোখুনির খেলা খেলতে হবে? কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!

লোকটার নাম ধ্যানচাঁদ। ওটা ওর আসল নাম নয়। ইন্ডিয়া যখন হকি খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ছিল, তখন ধ্যানচাঁদ ছিলেন সেই টিমের ক্যাপ্টেন। বিখ্যাত মানুষ, ভাল মানুষ। তাঁর নাম নিয়েছে একজন খুনি! এটাও তো অন্যায়।

রঘু কফি নিয়ে এল, সঙ্গে দু’খানা টোস্ট।

কাকাবাবু বললেন, “টোস্ট খাব না। নিয়ে যা।”

রঘু বলল, “খালি পেটে গরম কফি খাবেন? তাতে পেট জ্বালা করে।”

কাকাবাবু বললেন, “কে বলল, পেট জ্বালা করে? তুই খেয়ে দেখেছিস?”

রঘু বলল, “আমি জীবনেই কফি খাইনি স্যার। কিন্তু লোকে যে বলে!”

কাকাবাবু বললেন, “জীবনে কফি খাসনি? আজ এক কাপ খেয়ে দ্যাখ। দু’চামচ চিনি দিবি, নইলে খুব তেতো লাগবে।”

“আপনি তো চিনি-দুধ কিছুই নেন না। এই কালো কালো জিনিসটা কী করে যে খান! একটা অন্তত টোস্ট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেয়ে ফেলুন আগে।”

“তোকে আর সর্দারি করতে হবে না। বলছি, টোস্ট দুটো নিয়ে যা!”

“না, নিয়ে যাব না। একটা অন্তত খেতেই হবে। খেয়ে নিন কাইন্ডলি।”

“কাইন্ডলি? খুব ইংরেজি শেখা হয়েছে! নিয়ে যাবি, না ছুড়ে ফেলে দেব?”

রঘু এবার ধমক খেয়ে টোস্ট দুটো তুলে নিয়ে মুখ চুন করে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর একটু অনুতাপ হল। অত বকলেন কেন রঘুকে? ও তো ভাল কথাই বলছিল। হঠাৎ তাঁর মেজাজ গরম হয়ে গেল, এরকম তো হয় না! ওই ধ্যানচাঁদই তাঁর মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে। একবার মেজাজ খারাপ হলে অনেকক্ষণ ধরে মাথার মধ্যে সেটাই ঘোরে। মেজাজ ঠিক করতে হলে গান গাইতে হয়। কফিতে এক চুমুক দিয়ে কাকাবাবু গুনগুন করে গান ধরলেন :

“তবে রে রাবণ ব্যাটা

তোর মুখে মারব বাঁচাটা

.....

তোরে এখন বাঁচায় কে’টা বল!

তোর মুখের দু’ পাটি দস্ত

ভাঙিয়া করিব অন্ত

এখনি হবে প্রাণান্ত

আয় রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল।

‘মারব ঝাঁটা’র পর আর-একটা কী লাইন আছে, মনে পড়ছে না। গানের লাইন ভুলে গেলে খুব অস্বস্তি লাগে। কাকাবাবু দু’-তিনবার গেয়ে গেয়ে লাইনটা মনে আনবার চেষ্টা করলেন।

দরজার কাছ থেকে সন্ত জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবু, আজ মর্নিং ওয়াকে গিয়েছিলে?”

সন্ত সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। এখনও চোখমুখ ধোয়নি। মাথার চুলও খোঁচা খোঁচা। হাতে টুথব্রাশ। সে কাকাবাবুর বাথরুমটা ব্যবহার করে।

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, যাব না কেন? এই তো ঘুরে এলাম।”

সন্ত বলল, “কাল আমরা বাড়ি ফিরেছি রাত দুটোয়। তুমি এত কম ঘুমোও কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “আমার বেশি ঘুমের দরকার হয় না। তোর মতো বাচ্চারাই বেশি ঘুমোয়।”

সন্ত হেসে বলল, “আমি আর কী ঘুমোই! জোজো? জোজো যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে। কাল আমরা বাসে করে যাচ্ছিলাম, বসার জায়গা পাইনি। জোজো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিমোচ্ছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “আমরা কে কতদিন বাঁচব ঠিক নেই। তার মধ্যে অর্ধেকটা সময় যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই, তা হলে অনেক কিছুই দেখা হবে না, অনেক কাজও করা হবে না। জীবনের চার ভাগের এক ভাগ ঘুমের জন্য বরাদ্দ। সেটাই যথেষ্ট।”

সন্ত বলল, “তার মানে দিনে ছ’ঘণ্টা তো? আমি তার বেশি ঘুমোই না। এক-এক দিন হয়তো বেশি ঘুমিয়ে ফেলি, কিন্তু আবার এক-এক দিন, মানে ধরো, পরীক্ষার সময় যে রাত জেগে পড়াশোনা করি, তখন তিন ঘণ্টার বেশি ঘুম হয় না। তা হলে অ্যাভারেজে সেই ছ’ঘণ্টা!”

কাকাবাবু বললেন, “তোর বন্ধু জোজোকেও সেকথা বুঝিয়ে দিস।”

“আমি তোমার বাথরুমে যাব?”

“যা।”

“বিকেলে ক’টার সময় ট্রেন? আজ তো আমাদের শিমুলতলা যাওয়ার কথা।”

“উঁ উঁ, আজ যাব কিনা ভাবছি।”

“কেন? এখন আমাদের ছুটি আছে। চলো, চলো!”

“দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি।”

সম্ভব বাথরুমে চলে গেল। কাকাবাবু একটুক্কণ ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন।

কারণটা অতি সামান্য। আসলে বেড়ানোটাই মূল উদ্দেশ্য। তাই সম্ভব আর জোজো শিমুলতলায় যাওয়ার জন্য উৎসাহে মেতে আছে। কিন্তু এখন কি যাওয়া উচিত? ধ্যানচাঁদ বলে গেল, কোথাও পালাবার কিংবা লুকোবার চেষ্টা করবেন না। শিমুলতলায় গেলে যদি সে ভাবে, তিনি কলকাতা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন? সে নিশ্চয়ই নজর রাখবে। অথচ, সে তো দিল্লি ফিরে গেল। তা হলে নজর রাখবে কী করে? সে যাই-ই হোক, শিমুলতলায় যাওয়ার প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করা আছে। ওই লোকটার হুমকিতে তিনি প্রোগ্রাম বদলাবেন কেন? ট্রেনের টিকিটও কাটা আছে, তা হলে যেতেই হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে কাকাবাবু একটা স্টিলের আলমারি খুললেন। এই আলমারিটা নানারকম জিনিসে ঠাসা। প্রায় সব জিনিসই তাঁর দেশ-বিদেশের ভক্তরা উপহার দিয়েছে। অনেক কিছুই ব্যবহার করা হয় না। সুন্দর সুন্দর মূর্তি, দু'খানা দেওয়ালঘড়ি, অনেক রকমের জামা, মাথার টুপি, সুন্দর খাপওয়ালা চারখানা ছোরা। একজোড়া ক্রাচও রয়েছে। কাকাবাবু যে ক্রাচ দুটো ব্যবহার করছেন, তা অনেক দিনের পুরনো। রং চটে গিয়েছে। কাকাবাবু পুরনো জিনিসই বেশি পছন্দ করেন। একেবারে একেজো না হলে তিনি কিছুই ফেলতে চান না।

কাকাবাবু ক্রাচজোড়া বের করলেন। ভারী সুন্দর দেখতে। ঝকঝকে পালিশ করা কালো রঙের, হাতলের কাছে হাতির দাঁতের কারুকাজ। এ ছাড়াও রয়েছে নানারকম কায়দা, পরপর কয়েকটা বোতাম। একটা বোতাম টিপলে ইচ্ছেমতো ক্রাচটাকে ছোট কিংবা বড় করা যায়। সুইডেনে কাকাবাবুর বন্ধু গুনার মিডডাল এই ক্রাচ দুটো উপহার দিয়েছিলেন। তিনি বারবার বলেছিলেন, “রাজা, তুমি এই ক্রাচ অবশ্যই ব্যবহার করবে। তোমাকে কত জায়গায় যেতে হয়। দেখবে, এটা খুব কাজে লাগবে। বেশি ভারীও নয়!”

সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে বলে কাকাবাবু এত দিন ব্যবহার করেননি। নিজের পুরনো ক্রাচ দুটো চালান করে দিলেন খাটের নীচে। কয়েকটা জামাও বের করে নিলেন। এগুলোও পরে ফেলাই ভাল। শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী? মরে গেলে তো আর পরাই হবে না। সম্ভব গায়েও ফিট করবে না এইসব জামা।

হঠাৎ মরার কথা মনে আসছে কেন বারবার? ওই ধ্যানচাঁদ নামের লোকটা

সত্যিই তাঁকে খুন করতে পারবে? তার চেয়েও বড় কথা, আত্মরক্ষার জন্য কাকাবাবু কি বাধ্য হবেন ওকে খুন করতে? কিন্তু তিনি যে তা চান না। যত বড় ক্রিমিনালই হোক, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান না কাকাবাবু। একটা বেশ মোটা মতো জামাও বের করলেন। এ জামা খুব ঠান্ডার দেশে পরবার মতো। শিমুলতলায় শীত হবে না। এখন গরমকাল। তবু কাকাবাবু জামাগুলো একটা ছোট সুটকেসে ভরে নিলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সন্তু জিজ্ঞেস করল, “তা হলে কী ঠিক হল? আমরা শিমুলতলায় যাচ্ছি তো?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, যাচ্ছি। দুপুর সাড়ে বারোটায় ট্রেন। জোজোকে খবর দে।”

সন্তু বলল, “জোজো এগারোটার মধ্যে এসে যাবে। কাকাবাবু, আমরা ওখানে ক’দিন থাকব?”

কাকাবাবু বললেন, “বাদশা তো বলেছে, অন্তত দিনসাতেক থেকে আসতো। অতদিন ওখানে থেকে কী করব? আমি তো ভাবছি, বড়জোর দিনতিনেক ...”

সন্তু বলল, “না, না, সাতদিনই ভাল। ওদিকে অনেক বেড়ানোর জায়গা আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “দেখা যাক, গিয়ে যদি ভাল লাগে! তবে ভূতটুত আমার বেশিদিন সহ্য হয় না।”

সন্তু বলল, “বাদশাদা তো বলে গিয়েছেন, ভূত দেখা যাবেই। গ্যারান্টি। বাদশাদা তো বাজে কথা বলার লোক নন। তা হলে কি আমরা এবার সত্যি সত্যি ভূত দেখব!”

কাকাবাবু বললেন, “ধুত। যত সব বাজে কথা!”

এগারোটার মধ্যেই ঠিক জোজো এসে হাজির। সঙ্গে একটা ঢাউস ব্যাগ। সেটা আবার একদিকে লাল, আর একদিকে কালো। তার উপরে সাদা অক্ষরে কী যেন লেখা। দু’-এক জায়গা একটু কুঁচকে আছে বলে লেখাগুলো ঠিক পড়া যাচ্ছে না।

সন্তু বলল, “এ কী রে, এত বড় ব্যাগ এনেছিস কেন?”

জোজো বলল, “এখানে ক’দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। ওখানেও বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টিতে জামা-প্যান্ট ভিজবে। কাদায় আছাড় খেতে পারি। তাই বেশি জামা-প্যান্ট নিয়েছি।”

সন্তু ভুরু তুলে বলল, “এত বড় ব্যাগ ভারতি শুধু জামাকাপড়?”

জোজো বলল, “না, তা নয়। বাবা বললেন, শিমুলতলায় যাচ্ছিস? বাঃ, বেশ ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গা। ওখানকার জল খেলে খুব খিদে পায়। তাই আমি ভাবলুম, যখন-তখন খিদে পেলে কী খাব? কখন কী পাওয়া যাবে, তাও তো জানি না। সেই জন্য দশ প্যাকেট বিস্কুট আর চিজ নিয়েছি। আর ডিমের পাউডার।”

“ডিমের পাউডার আবার কী?”

“আমরা এখন ডিমের পাউডার বানাচ্ছি বাড়িতে। আস্ত ডিম সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনেক ঝামেলা, ভেঙেটেঙে যায়। তাই আগে ডিমের অমলেট বানাই। সেটাকে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে ফেলি। তারপর ইচ্ছেমতো সেই গুঁড়ো খানিকটা জলে মিশিয়ে গরম করলেই আবার অমলেট হয়ে যায়। একই রকম খেতে লাগে। কাকাবাবু, আপনি খেয়ে দেখবেন তো?”

“দেখব টেস্ট করে।”

“জোজো, তোর ব্যাগের উপর কী লেখা রে?”

জোজো ব্যাগের কোঁচকানো জায়গাগুলো ঠিক করল। তখন পড়া গেল, দু’ লাইনে লেখা :

এবার যাব শিমুলতলায়
গান শুনব ভূতের গলায়।

নিজেই সেই লাইন দুটো উচ্চারণ করে পড়ে জোজো বলল, “কাল থেকে পোয়েট্রি লিখতে শুরু করেছি, ইংলিশে আর বাংলায়। প্রথমে লিখেছিলাম, এবার যাব শিমুলতলা। চেপে ধরব ভূতের গলা! কিন্তু সেটা ঠিক পছন্দ হল না। কাকাবাবু, এটা বেটার হয়নি?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, এটাই বেটার। কিন্তু এখানে ভূতদের মধ্যে যদি ব্রহ্মদত্তি থাকে, তা হলে তোমার এই লেখা দেখে গান শোনার বদলে রেগে গিয়ে তোমারই গলা চেপে ধরবে।”

“কেন, কেন, রেগে যাবে কেন?”

“বামুন মরলে তো ব্রহ্মদত্তি হয়। সাধারণত তারা লেখাপড়া জানে। ভুল বানান সহ্য করতে পারে না। তোমার ওই লেখায়...”

“কী, ভুল লিখেছি? মূল বানান ম-এ দীর্ঘ উ না?”

“তা ঠিক। কিন্তু এটা তো সে মূল নয়। শিমুল একটা গাছের নাম। সংস্কৃতে

যাকে বলে শাল্মলি। সেই শাল্মলি থেকে চলতি কথায় শিমুল। তুমি পোয়েট্রি লিখছ, ভুল বানান তো চলবে না।”

“আপনার কথা শুনেই আমার নেক্সট দু’লাইন মনে এসে গেল! বলব?

যদি দেখি ব্রহ্মদত্তি
তবে বলব তিন সত্যি!”

“এটা লিখে রাখতে হবে।”

সন্তু বলল, “ইংরেজিতে কী কবিতা লিখেছিস, শোনা তো!”

জোজো বলল,

“There was a man Called Kissinger
Who was a very bad singer.”

সন্তু বলল, “বাঃ, আর-একটা শোনা।”

কাকাবাবু বললেন, “পরে হবে। পরে হবে।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, আপনার এই ক্রাচ দুটো দারুণ দেখতে তো!”

কাকাবাবু বললেন, “দারুণ বলেই এতদিন ব্যবহার করিনি। আজ ভাবলাম, শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী? চলো, তা হলো।”

একটা ট্যাক্সি ডেকে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে জসিডি।

জসিডি স্টেশনে দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাদশা। তার পুরো নাম সিরাজুল হক, সবাই তাকে বাদশা বলেই ডাকে। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া চেহারা। খুব দিলদরিয়া মানুষ। বন্ধুবান্ধবদের খুব খাওয়াতে ভালবাসে। মধুপুর, দেওঘর, জসিডি, শিমুলতলায় তার চারখানা রেডিয়ো, টিভির দোকান আছে। চলে বেশ ভালই। তার নিজের বাড়ি শিমুলতলায়। সেখানে সে আর-একটা বড় বাড়ি কিনেছে।

বাদশা একটা টাটা সুমো গাড়ি এনেছে। জসিডি থেকে শিমুলতলা বেশি দূর নয়।

গাড়িতে উঠে বাদশা বলল, “কাকাবাবু, আজ রাতেই কি ভূতের বাড়িতে

থাকবেন, না প্রথম রাতটা কাটাবেন আমার বাড়িতে? আমার বাড়িতেও ভাল ব্যবস্থা আছে।”

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই সন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, “ভূতের বাড়ি, ভূতের বাড়িতে থাকব!”

কাকাবাবু বললেন, “দ্যাখো বাদশা, আমি তো আর ভূত ধরতে আসিনি। সেটা আমার কন্মো নয়। আমি এসেছি, সন্ত আর জোজো এই দিকটায় বেড়াতে আসতে চাইছিল আর তোমার বাড়িতে নাকি দারুণ বিরিয়ানি রান্না হয়, তা চেখে দেখার জন্য। যে-বাড়িতেই থাকি, তাতে কিছু আসে যায় না।”

জোজো জিঞ্জেস করল, “সত্যি ভূত আছে?”

বাদশা বলল, “সত্যি ভূত না মিথ্যে ভূত, তা জানি না। তবে পাড়ার লোক ওটাকে বলে ‘ভূতের বাড়ি’। আমি নিজের কানে শুনেছি, ও-বাড়িতে এক-এক দিন রাতে নানারকম বিকট শব্দ হয়। দুমদুম করে পায়ের আওয়াজ হয় সিঁড়িতে। দরজা-জানলা দড়াম দড়াম করে পড়ে। ভয়ে কেউ সন্দের পর ওই বাড়ির ধারেকাছে যায় না।”

সন্ত বলল, “শুধু শব্দ? ভূতে কোনও ক্ষতি করে না?”

বাদশা বলল, “এককালে এখানে বাঙালিরা অনেক বড় বড় বাড়ি বানিয়েছিল শখ করে। ছুটি কাটাতে আসত সপরিবার। এখন অনেকেরই আর বংশধর নেই। থাকলেও এদিকে আসে না, বিলেত-আমেরিকায় যায়। বাড়িগুলো ভেঙে ভেঙে নষ্ট হচ্ছে। সেরকম একটা বাড়ি আমি কিনেছি। দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রমথনাথ মিত্রের বাড়ি ছিল ওটা। পনেরোখানা ঘর, বিশাল বিশাল বারান্দা, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান, সবই প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি পুরো বাড়িটাই ভেঙে ফেলে ওখানে একটা হোটেল বানাব ঠিক করেছি। কিন্তু ভূতেরা বাধা দিচ্ছে বলে হচ্ছে না।”

সন্ত জিঞ্জেস করল, “কী করে বাধা দিচ্ছে? শুধু আওয়াজ করে?”

বাদশা বলল, “না। কন্ট্রাক্টরের একজন লোককে একদিন দুপুরে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। তার হাত ভেঙে গিয়েছে। সে আর ও বাড়িতে ঢোকে না। বাড়িটা যেদিন ভাঙা শুরু হল, সেদিন...”

জোজো বলল, “যাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সে কি কাউকে দেখেছে?”

বাদশা বলল, “হ্যাঁ, সে বলেছে, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সে দেখেছে, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা কাপড় পরা কঙ্কাল!”

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, “সাদা কাপড় পরা। সব ভূতই সাদা কাপড় পরে!”

বাদশা আবার বলল, “যেদিন বাড়িটা ভাঙা শুরু হয়, সেদিন বিকেলের দিকে একজন মিস্তিরি রক্তবমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর সেও বলেছে, একটা কঙ্কাল এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে! থু-থু করে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে তার গায়ে। সে গ্রামে ফিরে গিয়েছে। আর কোনও মিস্তিরিও কাজ করতে রাজি হচ্ছে না।”

কাকাবাবু বললেন, “কঙ্কালের থুতু? কঙ্কালের কি জিভ থাকে? কখনও শোনা যায়নি।”

সন্তু বলল, “আমিও এটা নতুন শুনছি।”

কাকাবাবু বললেন, “যে মিস্তিরি রক্তবমি করেছে, তার টিবি রোগ আছে কিনা খোঁজ নেওয়া হয়েছে? এরা প্রচুর পরিশ্রম করে। সেই অনুযায়ী ভাল খাবারদাবার খেতে পায় না। অনেকেরই টিবি হয়। রোগটা অনেকখানি ছড়ালে রক্ত পড়ে।”

বাদশা বলল, “কাকাবাবু, আমি জানি, আপনি এসব কিছুই বিশ্বাস করেন না। সেই জন্যই আপনাকে এখানে এনেছি। আপনি কয়েকদিন থেকে বলে দিন, সত্যিই ব্যাপারটা কী হচ্ছে। যদি ভূত বলে কিছু না থাকে, তা হলে লোকে ভয় পাচ্ছে কেন? সেটাই আমি জানতে চাই।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, ভূত দেখা কি অসম্ভব?”

কাকাবাবু বললেন, “না, অসম্ভব কেন হবে? কেউ কেউ দেখে। মানুষ তিন রকম। যারা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে, ঠাকুর-দেবতার পূজো করে, ছেলেবেলা থেকেই এসব বিশ্বাস মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে, তারা কখনও ভূতও দেখতে পারে, ঠাকুর-দেবতাদেরও দেখতে পারে। বিশ্বাস থেকেই তো ওসব তৈরি হয়। আর যারা বিশ্বাস তো করেই না, ওরকম কিছু সম্ভবই নয় বলে মনে করে, তারা জীবনেও ভূত দেখতে পাবে না। আর একদল আছে, যারা ঠিক বিশ্বাসও করে না, আবার জোর অবিশ্বাসও করে না। তারা কখনও দেখতেও পারে, আবার না-ও দেখতে পারে।”

জোজো বলল, “আরও একদল আছে, যারা ভূত বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাতে একা থাকতে ভয় পায়।”

সন্ত বলল, “যেমন তুই!”

জোজো বলল, “ঠিক বলেছিস। আর তুই কোন দলে?”

সন্ত বলল, “আমার মতোও একদল আছে, যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, ভয়ও পায় না, কিন্তু ভূতের গল্প খুব ভালবাসে। ভাল গল্প হলে একটু একটু গা ছমছমও করে।”

কাকাবাবু বললেন, “অনেক সময় চোর-ডাকাতরা এরকম ভাঙা বাড়িতে আস্তানা গেড়ে ভূত সেজে ভয় দেখায়!”

বাদশা বলল, “তা যদি হয়, তা হলে তো ঝামেলা চুকেই গেল। সেই চোর-ডাকাতদের কোনও একটাকে কি চেষ্টা করলে ধরা যাবে না? একটাকে ধরলেই তাকে দেখিয়ে সবাইকে বলা যাবে, এই দেখুন ভূত নয়, জ্যান্ত মানুষ। তারপর সে ব্যাটাকে ধরে খুব করে পেটালেই অন্যদের সন্ধান পাওয়া যাবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি।”

গাড়িটা এসে থামল একটা লোহার গেটের সামনে। চারদিকে অন্ধকার। একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে ডেকে উঠল।

একটা বড় টর্চ জ্বলে বাদশা বলল, “এই হচ্ছে সেই বাড়ি। দেখুন, লোহার গেটের দু’পাশে দুটো পাথরের সিংহ ছিল, এখন মুণ্ডু নেই, পাশে গাছ গজিয়ে গিয়েছে। অনেক ঘরের ছাদ নেই। শুধু দুটো ঘর আস্ত আছে এখনও।”

কাকাবাবু বললেন, “ওতেই হবে। দু’খানা ঘরই যথেষ্ট। বাথরুমটাথরুম আছে তো?”

বাদশা বলল, “আমি ভেবে দেখলাম, আজকের রাতটা আপনারা আমার বাড়িতেই থাকুন। এখানে ঘরটর পরিষ্কার করা আছে ঠিকই, কিন্তু আলোর ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কাল সন্দের পর এখানে চলে আসবেন।”

সন্ত তবু বলল, “কেন, আজ থেকেই থাকি না। আমাদের সঙ্গে তিনখানা টর্চ আছে। আর আলো লাগবে না।”

বাদশার পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। খানিকক্ষণ কথা বলে সেটা অফ করে বাদশা বলল, “আমার স্ত্রী আজ কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন। প্রচুর খাবারদাবার করে রেখেছেন। সন্ত, আজ বরং খেয়েদেয়ে ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। কাল হয়তো সারারাত জাগতে হতে পারে।”

বাদশার নিজের বাড়ি সেখান থেকে মিনিটদশেকের পথ। সেটাও বেশ বড় বাড়ি। আলোয় ঝলমল করছে। আরও কিছু মানুষ আগে থেকেই বসে

আছেন বৈঠকখানায়। বোঝাই যাচ্ছে, আজ এটা নেমন্তন্ন বাড়ি।

তারপর প্রচুর খাওয়াদাওয়া আর গল্প করতে করতে রাত বারোটা বেজে গেল। পাশাপাশি দুটো ঘরে খাটের উপর বিছানা পাতাই আছে। সন্ত আর জোজো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।

প্রতিদিনই ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ বই পড়ার অভ্যেস কাকাবাবুর। তিনি একটা বই খুলে বসলেন। একসময় দেখলেন দেড়টা বেজে গিয়েছে। শুয়ে পড়লেন আলো নিভিয়ে।

ভোরবেলা জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে চোখে, কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ভারী নরম, নীলচে আলো। সূর্য ওঠার আগে এইরকম রং হয়, তারপর এই আলো হবে সোনালি। অনেক রকম পাখি ডাকছে, আর সেই সব ডাক ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে দুটো মোরগের কৌকর-কৌ, কৌকর-কৌ। কী গলার জোর ওদের!

কাকাবাবুর আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। উঠে চোখমুখ ধুয়ে তিনি জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লেন। এখানে এসেও তিনি মনিং ওয়াকের অভ্যেসটা ছাড়বেন কেন?

সন্ত আর জোজোকে তিনি ডাকলেন না। এ-বাড়ির অন্য কেউও এখনও জাগেনি মনে হয়। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

কী চমৎকার ফুরফুরে বাতাস। বাতাস এসে যেন গা জড়িয়ে আদর করছে। কলকাতায় বৃষ্টি হলেও এখানে বৃষ্টি নেই। তবে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। বেলা বাড়লেই গরম হবে।

লাল রঙের রাস্তা। দূরে পাহাড়ের রেখা। এই সময় রাস্তায় মানুষজন থাকার কথা নয়। তবু দুধওয়ালা কিংবা বাগানের মালির মতো কেউ যাচ্ছে সাইকেলে। তারা কৌতূহলে কাকাবাবুকে ফিরে ফিরে দেখছে। এদিকে সকলেই সকলকে চেনে। ক্রাচ বগলে এই নতুন মানুষটি কে, তারা ভাবছে।

কাকাবাবু সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, এক-একটা বড় বাড়ির ভগ্নস্তূপ। গেটে এখনও নাম লেখা আছে। এককালের বিখ্যাত সব বাঙালির নাম। তখনও বাঙালিরা এত গরিব হয়ে যায়নি। কিছু কিছু বাঙালি লেখাপড়া শিখে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক টাকা উপার্জন

করতেন। কত শখের এই সব বাড়ি। এখন অনেক বাড়িরই দরজা-জানলা খুলে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা।

কালকের সেই ভূতের বাড়িটা কোন দিকে, তা কাকাবাবু বুঝতে পারছেন না। অবশ্য অনেক ভাঙা বাড়িকেই রাতে ভূতের বাড়ি বলে মনে হতে পারে।

একটা কোকিল ডাকছে, খুব কাছেই। কিন্তু পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। কোকিল সব সময় পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে যে, দেখতে পাওয়া খুব শক্ত। কাকাবাবু তবু উঁকিঝুঁকি মেরে সামনের গাছগুলো দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পাশ থেকে কেউ একজন বলল, “স্যার, উইল ইউ হেল্প মি?”

কাকাবাবু চমকে উঠে দেখলেন, একটি অল্পবয়সি ছেলে, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে, প্যান্ট-শার্ট পরা, পাতলা চেহারা। কাঁধে একটা ব্যাগ।

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে ইংরেজিতে বলল, “স্যার, একটু হেল্প করবেন? আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি তো এখানে নতুন এসেছি, অনেক কিছুই চিনি না।”

ছেলেটি বলল, “দেখুন, এই কাগজটায় লেখা আছে।”

কাকাবাবু কাগজটা নিলেন। খুব বিচ্ছিরি হাতের লেখা। জড়ানো জড়ানো। তবু কষ্ট করে পড়বার চেষ্টা করলেন। “নিয়ার নাটোর প্যালেস। হাউজ অফ বাদশা। বিগ গার্ডেন। মিস্টার রাজা...”

আর পড়তে পারলেন না। এর মধ্যেই ছেলেটি তার ব্যাগ থেকে অনেক লম্বা পাকানো নাইলনের দড়ি বের করে ফস করে কাকাবাবুর গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দিল। এত তাড়াতাড়ি সে কাজটা সেরে ফেলল যে, কাকাবাবু বাধাও দিতে পারলেন না।

কাকাবাবু বললেন, “এ কী?”

ছেলেটি হি হি হি হি করে হেসে উঠল। তার গলার আওয়াজ বাচ্চা ছেলেদের মতো। হাসতে হাসতে সে বলল, “ছি ছি ছি, মিস্টার রায়চৌধুরী, আজ থারটিন্থ এপ্রিল। আজ থেকে ডেথ-ডেথ খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, মনে নেই? আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।”

দড়িটা খানিকটা লম্বা করে সে কাকাবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা ভাঙা বাড়ির পিছন দিকে। রাস্তার লোকজন কেউ দেখতে পাবে না তাদের।

ফাঁসটা এমন আঁট হয়ে গিয়েছে যে, কাকাবাবুর দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ছেলেটা আবার ব্যঙ্গের সুরে বলল, “আপনি এত সহজে ধরা দিলেন? ভেবেছিলাম, কয়েকটা দিন অন্তত লড়াই করতে পারবেন। বাঙালিরা কি লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে? এই বাঙালিদের মধ্যেই তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মেছিলেন!”

কাকাবাবু অতি কষ্টে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কে?”

ছেলেটি বলল, “আমি কর্নেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট। এই যাঃ, কর্নেল বলে ফেললাম! যাক গে, এখন আপনি জানলেও ক্ষতি নেই। আর তো বেঁচে থাকবেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা!”

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কর্নেল কোথায়?”

ছেলেটি বলল, “তা জেনে আপনার কী লাভ? বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আমি এখনই মেরে ফেলতে পারি। আপনার পকেটে রিভলভার আছে জানি। কিন্তু আপনি পকেটে হাত ঢোকবার চেষ্টা করলেই আমি দড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান দেব। সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার গলায় যে ফাঁসটি দিয়েছি, ওতে একটা মেটাল রিং আছে। সেটা আপনার গলায় কেটে বসে যাবে। আর এই যে দড়িটা দেখছেন, এটাও নাইলন আর মেটাল মেশানো। স্বয়ং ভীম এলেও এটা ছিঁড়তে পারবে না। এই ফাঁস আমরা সার্কাসের বাঘ-সিংহের গলায় পরাই।”

কাকাবাবু বলতে চাইলেন, “তুমি বুঝি সার্কাসে কাজ করো?” কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় খুব লাগছে।

ছেলেটি আবার বলল, “একটা গাড়ি আসবে, তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি আপনাকে এখানে মেরে ফেললেই ঝামেলা চুকে যেত। কিন্তু কর্নেল, মানে ধ্যানচাঁদ, নিজের হাতে আপনাকে শাস্তি দিতে চান।”

কাকাবাবু খুব চেষ্টা করে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, “আমি তোমার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নই। আমার কফি খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।”

ছেলেটি দারুণ অবাক হয়ে বলল, “কফি? আপনার আর জীবনে কফি খাওয়া হবে না। বললাম তো, আপনার আয়ু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে দ্যাখো!” তিনি একটা ক্রাচ উঁচু করে তার গায়ের একটা বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা লকলকে ছুরি। সেটা দড়িটায় ছোঁয়ানো মাত্রই কচাত করে কেটে গেল। প্রায় চোখের নিমেষে, একটুও ঘষতে হল না।

টাল সামলাতে না পেরে ছেলেটি চিত হয়ে পড়ে গেল।

কাকাবাবু তার বুকে অন্য ক্রাচটা চেপে ধরে বললেন, “নোড়ো না। দেখলে তো, ভীমও যে-দড়ি ছিঁড়তে পারে না, এ-যুগের অস্ত্র দিয়ে কত তাড়াতাড়ি সে দড়ি কাটা যায়? সাধারণ ছুরির চেয়ে এই ছুরিটায় ধার এক হাজার গুণ বেশি।”

ছেলেটির চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। যে-দড়ি বাঘ-সিংহ ছিঁড়তে পারে না, একটা ছুরি দিয়ে এক মুহূর্তে সেটা কাটা হয়ে গেল!

কাকাবাবু গলার ফাঁসটা খানিকটা আলগা করে নিয়ে বললেন, “তুমি সার্কাসে কাজ করো। তোমার নাম কী?”

ছেলেটি বলল, “বলব না। বেশি কথার দরকার নেই। আপনি আমাকে খুন করুন। আই অ্যাম রেডি।”

কাকাবাবু বললেন, “কেন, মারব কেন? এত সুন্দর একটা সকাল, এর মধ্যে খুনোখুনির কথা ভাবতে তোমাদের লজ্জা করে না?”

ছেলেটি বলল, “এই খেলায় কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি হেরে যায়, তাকে মেরে ফেলার নিয়ম আছে। আপনিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারেন। কিল মি। আমি হেরে গিয়েছি, আমাকে খতম করে দিন।”

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, “চোপ! সার্কাসে চাকরি করছিলে, তা ছেড়ে এই বাজে খেলায় যোগ দিতে তোমাকে কে বলেছে? কত টাকা পাবে? উঠে দাঁড়াও!” কাকাবাবু ক্রাচটা তার বুকের উপর থেকে সরিয়ে নিলেন।

সে জেদির মতো বলল, “না, উঠব না। এখানেই আমার ডেডবডি পড়ে থাকবে।”

কাকাবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, “ওঠো বলছি!”

সে বলল, “না উঠলে আপনি কী করবেন? মারবেন তো? মারুন! হেরে গিয়ে আমি দয়া চাই না।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি কী চাও বা না চাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মানুষ খুন করা আমার কাজ নয়। তুমি যদি না ওঠো, তা হলেও আমি তোমায় প্রাণে মারব না। পায়ে গুলি করব। তুমি চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকবে আমার মতো। সেটা ভাল হবে?”

ছেলেটি এবার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, “যাও, তোমার কর্নেল ধ্যানচাঁদকে গিয়ে বলো, আজই এই খেলা শেষ করে দিতে। ওর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই

দায়ী নই। তবু আমি হাজারবার ক্ষমা চাইতে রাজি আছি।”

ছেলেটি বলল, “ওসব বলে আর লাভ নেই। একবার এ-খেলা শুরু হলে হেস্তনেস্ত না হলে থামে না। কর্নেল আপনাকে খুন করবেনই। আপনি যদি আমাকে আজ ছেড়েও দেন, তা হলেও আমি আবার আপনাকে মারবার চেষ্টা করব।”

কাকাবাবু বললেন, “এ যে দেখছি, মহা পাজি ছেলে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তবে একটুআধটু শাস্তি তো দেওয়া যেতেই পারে। আমার একটা নিয়ম আছে, যে আমার গায়ে হাত তোলে, তাকে আমি কিছু না-কিছু শাস্তি দিই। তুমি আমার গলায় ফাঁস পরিয়েছ, তার জন্য তোমাকে দু’-তিনটে থাপ্পড় অন্তত খেতেই হবে।” তিনি ছেলেটির চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। তারপর তাকে থাপ্পড় মারতে গিয়েও থেমে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। চেয়ে রইলেন তার চোখের দিকে। গলার আওয়াজ শুনেই তাঁর একটু সন্দেহ হয়েছিল, এখন ওর চোখ দুটো দেখে কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, “ছেলে তো নয়, এ যে দেখছি একটি মেয়ে!”

সে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, “হ্যাঁ, মেয়ে, তো কী হয়েছে? মেয়েরা অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারে না? মেয়েরা এখন সব পারে।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। মেয়েরা সব পারে। এমনকী, মানুষ খুন করতেও পারে। কিন্তু আমি এখনও ওল্ড ফ্যাশন্ড। আমি মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে পারি না। তোমাকে যে দু’-তিনটে থাপ্পড় মারব ভেবেছিলাম, তা তো আর হচ্ছে না। তা হলে কি আমি তোমায় এমনি এমনি ছেড়ে দেব?”

মেয়েটি বলল, “থাপ্পড় মারতে পারবেন না কেন? মারুন। তারপর আমিও আপনার নাকে এখন একটা ঘুসি মারব।”

“ওরে বাবা, তেজ আছে দেখছি! শোনো, আমি তোমার সম্পর্কে কী ঠিক করলাম। যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, তা হলে তোমাকে এখনই ছেড়ে দেব। আর যদি উত্তর না দিতে চাও, তা হলে আমার গলার ফাঁসটা খুলে তোমার গলায় পরিয়ে দেব, তারপর তোমাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমি চলে যাব। কোনটা চাও?”

“আপনার কী প্রশ্ন, শুনি আগো।”

“তোমার নাম কী? তুমি আমার নাম জানো। অথচ আমি তোমার নাম জানি না, এতে কথাবার্তা বলা যায় না।”

“এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার নাম লায়লা।”

“সুন্দর নাম। তুমি ছেলে সেজে এসেছ কেন?”

“বেশ করেছি। অনেক মেয়েই তো আজকাল প্যান্ট-শার্ট পরে।”

“তুমি সার্কাসে কাজ করো?”

“করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি।”

“সার্কাসের কাজ ছেড়ে তুমি এই কর্নেল ধ্যানচাঁদের সঙ্গে কুৎসিত কাজে যোগ দিয়েছ কেন? সে তোমাকে বেশি টাকা দিচ্ছে?”

“টাকার জন্য নয়। উনি একসময় আমার মাকে একটা খুব বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।”

“তোমার মাকে বাঁচিয়েছেন, সেটা খুব ভাল কাজ। মহৎ কাজ। কিন্তু কেউ একটা মহৎ কাজ করার পর যদি একটা খুব খারাপ কাজ করে, কোনও মানুষকে মারতে চায়, তা হলে সে আরও খারাপ লোক হয়ে যায়। মানুষের প্রাণ বাঁচানোই মানুষের মতো কাজ, আর বিনা কারণে কাউকে খুন করলে সে আর মানুষ থাকে না। জঙ্গলের হিংস্র পশুদের সঙ্গে তার তফাত কী?”

“আপনাকে আর উপদেশ বাড়তে হবে না। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি আজ আমাকে ছেড়ে দিলেন কিংবা দয়া করলেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যে-কোনও জায়গায়, আবার আপনাকে ধরব। আপনাকে মেরে ফেলা হবেই, এটা সোজাসুজি বলে দিলাম। এটাই আমার ডিউটি।”

“ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করে দেখো। সেবারেও যদি না পারো, তখন আমি তোমাকে ধরে ফেললে, কিন্তু আর ছাড়ব না। তখন তোমার হাত-পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একটা সার্কাসের দলে ভরতি করে দেব। সেখানে তুমি দড়ির উপর ডিগবাজি খাবে। সেখান থেকে যাতে তুমি পালাতে না পারো, সে ব্যবস্থাও করা হবে। এখন যাও, দৌড়োও! আমার চোখের সামনে আর থেকো না!”

লায়লা সত্যিই এক দৌড় লাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বাড়ির আড়ালে।

কাকাবাবু এবার খুব সাবধানে গলার ফাঁসটা খুললেন। জিনিসটা খুবই সাংঘাতিক। দড়ির মধ্যে আবার একটা লোহার রিং, তাতে আবার খাঁজকাটা। দড়িটা ধরে জোরে টানলেই গলার মধ্যে একেবারে চেপে বসে যাবে। এই জিনিসটা কাকাবাবু সঙ্গে নিয়ে যেতে চান না। সম্ভবদের কাছে ধ্যানচাঁদের হুমকির কথা কিছুই বলেননি। আজ সকালের এই ঘটনার কথাও তিনি চেপে

যাবেন। ওরা এখানে বেড়ানো আর ভূত নিয়ে মজা করার মেজাজে আছে। কী দরকার তা নষ্ট করার!

এটা এখানে ফেলে গেলেও কেউ না-কেউ পেয়ে যাবে। সে এটা ব্যবহারও করতে পারে। কাকাবাবু ফাঁসটা হাতে নিয়ে ফিরতে লাগলেন। আসবার পথে তিনি একটা বড় পুকুর দেখেছিলেন। সেটার কাছে এসে কাকাবাবু খুব টিপ করে ফাঁসটা ছুড়ে দিলেন। পুকুরের ঠিক মাঝখানে সেটা ঝুপ করে পড়েই ডুবে গেল। যাক। নিশ্চিন্ত।

সন্ত, জোজোরা জেগে উঠেছে এর মধ্যে। বাইরের বারান্দায় বসেছে চা নিয়ে।

কাকাবাবু ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা, ঠিক পনেরো মিনিট দেরি হয়েছে তাঁর কফি খাওয়ার। ওই লায়লা নামের মেয়েটির জন্য। কী সাংঘাতিক তেজি মেয়ে। কাকাবাবু তেজি মেয়েদেরই পছন্দ করেন। এইরকম তেজি মেয়ে কত রকম দারুণ দারুণ কাজ করতে পারে। তার বদলে খুনোখুনির খেলায় মেতেছে, এটা খুব দুঃখের ব্যাপার।

জোজো একটা টোস্টে জ্যাম মাখাতে মাখাতে বলল, “কাকাবাবু, আপনার দেরি দেখে আমরা ব্রেকফাস্ট শুরু করে দিয়েছি।”

কাকাবাবু বললেন, “বেশ করেছ। এবার আমার কফি দিতে বলো।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, আমরা সবাই আজকাল বলি ব্রেকফাস্ট। এর কি কোনও বাংলা নেই? সন্ত বলছে, জলখাবার। কিন্তু জলখাবার তো স্ন্যাক্স, বিকেলেও খাওয়া যায়। ব্রেকফাস্ট কিন্তু একেবারে ঠিক ঠিক। সারারাত তো আমরা না খেয়ে থাকি, তাই সকালের প্রথম খাবারটা উপোস ভাঙা।”

কাকাবাবু বললেন, “ব্রেকফাস্টের আর-একটা বাংলা আছে। প্রাতরাশ। সেটা ঠিক চলে না। হিন্দিতে বলে ছোট্ট হাজরি। মানে দুপুরেরটা বড় খাবার, সকালেরটা ছোট।”

সন্ত বলল, “জোজো সকালেই বড় খাবার খেয়ে নেয়। এর মধ্যেই পাঁচটা টোস্ট, দুটো কলা, ডবল ডিমের অমলেট খেয়ে ফেলেছে। দুটো সন্দেশ বাকি আছে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “অমলেট মানে সেই এগ পাউডার নাকি?”

জোজো বলল, “না, না, এখানে ফ্রেশ ডিম আছে। এখন পাউডারের দরকার হবে না।”

বারান্দায় উঠে এসে চেয়ারে বসে পড়ে কাকাবাবু বললেন, “আমার

বাবার মুখে শুনেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সত্যিই এগ পাউডার পাওয়া যেত। যেসব মিলিটারি পাহাড়ে-জঙ্গলে যুদ্ধ করতে যেত, তারা আর সেখানে ডিম পাবে কোথায়? তাই এগ পাউডার গুলে খেত!”

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে বলল, “দেখলি, দেখলি!”

সন্তু বলল, “আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। শিমুলতলায় অনেক ডিম পাওয়া যায়।”

বাদশা নিজেই কফি নিয়ে এল কাকাবাবুর জন্য। তারপর বলল, “আজ দুপুরে গিরিডি বেড়াতে যাবেন? সুন্দর জায়গা। কয়েকটা ঝরনা আছে। একসময় আমাদের বাঙালিদের খুব প্রিয় জায়গা ছিল গিরিডি। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, আরও অনেকে ওখানে গিয়ে থাকতেন।”

কাকাবাবু বললেন, “ওদের জিজ্ঞেস করো।”

সন্তু বলল, “আজ না। আজ আমরা শুধু ভূত দেখব। বেড়াতে যাব কাল।”

বাদশা বলল, “প্রতিদিনই যে ও-বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়, তা নয়। এক-একদিন কিছুই হয় না।”

জোজো বলল, “বাদশাদা, তুমি কখনও নিজের চোখে ভূত দেখেছ?”

বাদশা বলল, “না, তা দেখিনি। তবে নানারকম আওয়াজ শুনেছি, তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।”

জোজো বলল, “কীরকম আওয়াজ? কীরকম?”

বাদশা বলল, “যেমন ধরো, একটা মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। আমি টর্চ জ্বলে সারা বাড়ি খুঁজে দেখেছি, কোথাও কোনও মেয়ে নেই, কেউ নেই, তবু কান্নার শব্দ। আবার কখনও কাঁরা যেন বেশ কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। তখন কিন্তু ভয় করে সত্যি। এই দ্যাখো, বলতে বলতে আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, “এক-এক সময় ভয় পেতেও তো ভাল লাগে। জীবনে কখনও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, দুঃখের কান্না নেই। সে তো খুব একঘেয়ে ব্যাপার।”

বাদশা বলল, “কাকাবাবু, পটনা থেকে আমি ডিটেকটিভ এজেন্সির তিন জন লোক আনিয়েছি। তারা আজ দিনেরবেলা সারা বাড়ি সার্চ করে দেখবে। কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। সন্দের পর মেন গেটের বাইরে বসে তারা পাহারা দেবে, যাতে কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারে। এর পরেও

যদি অলৌকিক কিছু দেখা যায় কিংবা শোনা যায়, তা হলে তো মানতেই হবে!”

কাকাবাবু শুধু বললেন, “হুঁ।”

বাদশা জিজ্ঞেস করল, “আপনি হুঁ বললেন কেন? আপনিও তা হলে মেনে নেবেন?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমার মানা কিংবা না মানায় কী আসে যায়?”

বাদশা বলল, “বাঃ, আপনি বিখ্যাত রাজা রায়চৌধুরী। আপনি কত অত্যাশ্চর্য সমস্যা সলভ করেছেন। বিদেশেও লোকে আপনার নাম জানে।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি যে ভূতের ব্যাপারেও এক্সপার্ট, তা তো জানতাম না। কতকাল ধরে ভূতের গল্প চলে আসছে, কত লোক ভূত দেখেছে নিজের চোখে, এর মধ্যে আমার একার কথার কী দাম আছে? আচ্ছা ধরো, আজ প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ওই বাড়িতে ভূতটুত কিংবা অলৌকিক কিছু আছে। তখন তুমি কী করবে?”

বাদশা বলল, “হিন্দুরা এইসব বাড়িতে কী সব পুজোটুজো করে। তাতে নাকি অপদেবতা চলে যায়। আমি তো মুসলমান হয়ে পুজো করতে পারব না। আমি সেরকম অবস্থায় বাড়িটা বেচে দেব। আমার আর সস্তার দরকার নেই।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা বাদশা, তুমি কখনও যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করেছ?”

একটু চমকে গিয়ে বাদশা বলল, “হঠাৎ এ-কথাটা জিজ্ঞেস করছেন কেন?”

কাকাবাবু বললেন, “হঠাৎই মনে এল। তোমার চেহারা বেশ সুন্দর, গলার আওয়াজও ভাল। তুমি থিয়েটার-সিনেমায় অ্যাক্টিং করলে বেশ নাম করতে পারতে। আজকাল তো টিভিতেও কত রকম সিরিয়াল হয়, তাতেও অনেকে চান্স পায়।”

বাদশা বলল, “না, কাকাবাবু! কয়েকজন আমাকে বলেছে সিনেমায় নামতো। কিন্তু ওসব দিকে মন দিলে আমার ব্যাবসার বারোটা বেজে যেত। তবে, কলেজে পড়ার সময় দু’-একবার থিয়েটার করেছি।”

জোজো বলল, “বাদশাদা, সিনেমা-টিভিতে অ্যাক্টিং না করে ক্যাসেট, টিভি সেট বিক্রি করে।”

সন্তু বলল, “ক্যাসেটের কথা ভুলে যা। এখন ডিভিডি’র যুগ।”

কাকাবাবু বললেন, “সত্যিই আশ্চর্য, তাই না? একটা ছোট পাতলা ডিস্ক, তাতে পুরো একটা সিনেমা ভরা থাকে। কত দৃশ্য, কত ক্যারেক্টার, কত মারামারি, দু’ঘণ্টা ধরে ওইটুকু ডিস্ক চালিয়ে সব দেখা যায়!”

বাদশা বলল, “আজ দুপুরে কোনও সিনেমা দেখবেন? আমার কাছে অনেক সিডি আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা দেখা যেতে পারে। যা গরম পড়ছে, দুপুরে আর বাইরে বেরোনো যাবে না।”

দুপুরে আবার দারুণ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। কাল রাতে মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ ছিল, আজ পাঁচ রকম মাছ। আর তিন রকম মিষ্টি।

কাকাবাবু বললেন, “এতরকম পদ থাকলে কি ভাল করে খাওয়া যায়? শেষের দিকে কোনওটারই স্বাদ পাওয়া যায় না। বাঙালি রান্নায় শুধু একটা ডাল, একটা তরকারি আর একটা মাছ বা মাংসই তো ভাল।”

বাদশা বলল, “এ আর কী দেখছেন? আমার স্বশুরবাড়িতে খাবার টেবিলে মিনিমাম চোন্দো-পনেরো রকম আইটেম থাকে। মাংসই চার রকম!”

বাদশার স্ত্রী নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করছে। কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ফিরোজা, তোমার বাবা রোজ চোন্দো রকম পদ খান?”

ফিরোজা হেসে বলল, “না, কাকাবাবু, আমার বাবা মাছ-মাংসই খান না। শুধু নিরামিষ। তবে লোককে নেমস্তন্ন করে অনেক কিছু খাওয়াতে ভালবাসেন!”

কাকাবাবু বললেন, “আমাকে যদি কোনওদিন চোন্দো-পনেরোটা আইটেম খেতে হয়, তা হলে আমি মরেই যাব।”

সন্তু দু’রকম মাছ খাওয়ার পর আর কিছু নিতে চায়নি। জোজো একটার পর-একটা খেয়ে যাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, “জোজো, খুব বেশি খেলে কিন্তু কবিতা লেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য খুব কম খেতেন।”

জোজো বলল, “এসব তো আমি নিজে খাচ্ছি না।”

সন্ত মুখ তুলে অবাক হয়ে বলল, “নিজে খাচ্ছিস না মানে?”

জোজো বলল, “আমার এক মামা আছেন, তিনি মাছ খেতে খুব ভালবাসেন। একবার কুড়ি পিস রুই মাছ খেয়ে ফেলেছিলেন। তার পরেই সাতখানা কই মাছ। সেই মামার কথা ভাবছি, আর মাছগুলো আমার পেটে চলে যাচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, “একেই বলে নরাণাং মাতুল ক্রমঃ। মানে, ভাগনেরা সব মামার মতো হয়।”

জোজো বলল, “আমার সেই মামাকে নিয়ে তো কবিতা লিখেছি। শুনবেন?”

কাকাবাবু বললেন, “এখন নয়, এখন নয়। খেতে বসে কবিতা শুনতে নেই। আর খেতে বসে যদি কেউ গান গায়, তা হলে তার বউ পাগল হয়ে যায়!”

খাওয়ার পর খানিক বাদে দেখা হল সিনেমা। হেলেন অফ ট্রয়। গরম এতই বেড়েছে যে, পাখা চললেও সকলে দরদর করে ঘামছে।

ঠিক সন্ধের সময় গরগর করে মেঘ ডেকে উঠল। তারপরই শৌ শৌ হাওয়া। এখনই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। এই সময় ওদের সেই অন্য বাড়িটায় যাওয়ার কথা।

জোজো বারান্দায় এসে ঝড় দেখতে দেখতে বলল, “আকাশ একেবারে কালো। মনে হয়, জোর বৃষ্টি হবে। তাতে ঠান্ডা হয়ে যাবে, আজ রাতে ঘুমোব ভাল করে।”

সন্ত বলল, “সে কী রে, ঘুমোবি কী? আজ তো সারারাত জেগে থাকার কথা। ভূত দেখতে হবে না?”

এ-বাড়ির অনেক ঘরই একেবারে ভেঙে গিয়েছে, ছাদ নেই। তবে উপরে ওঠার সিঁড়িটা ঠিক আছে। একটা বারান্দা আর-একটা বড় হলঘর প্রায় আস্তই বলা যায়। আর দুটো ছোট ঘরের দেওয়ালে মস্ত মস্ত ফাটল। অনেক কাল আগের একটা ছবি ঝুলছে এক দেওয়ালে, বৃষ্টি পড়ে পড়ে ছবিটা এখন অস্পষ্ট। হয়তো মানুষের ছবি ছিল, এখন মনে হয় পাহাড় আর মেঘের ছবি।

বড় হলঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পাতা হয়েছে কার্পেট। ইলেকট্রিক নেই। বাদশা বলেছিল, বাইরে থেকে তার টেনে এনে আলো জ্বালিয়ে দিতে পারে। কাকাবাবু বলেছেন, ‘দরকার নেই। ইলেকট্রিকের আলোয় ভূত আসে না।’ তার বদলে এক পাশে জ্বলছে একটা হ্যাজাক বাতি। তার আলো বেশি দূর পৌঁছোয় না। তারপরে সব অন্ধকার। অবশ্য কয়েকটা টর্চ আছে সঙ্গে। আর আনা হয়েছে জলের বোতল, কয়েক বাস্ক স্যান্ডউইচ, দুটো বড় ফ্লাস্ক ভরতি চা আর কফি। বাদশা নিজে একটা রাইফেল নিয়ে এসেছে।

সকলে মিলে বসল একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। পিছন দিক দিয়ে কেউ আসতে পারবে না, সামনের দিক থেকে যে-ই আসুক, দেখা যাবে।

বাদশা বলল, “কথা বলা যাবে না কিন্তু, চুপচাপ থাকতে হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকব? তা কি সম্ভব? তা ছাড়া, কথা বললে দোষ কী? ভূত তো আমাদের ভয় পাবে না। আমাদেরই ভয় দেখাতে আসবে।”

সম্ভু বলল, “কাকাবাবু, ভূত মানুষকে ভয় দেখায় কেন? তাতে ভূতদের কী লাভ?”

কাকাবাবু বললেন, “তা আমি জানব কী করে? আমি তো ভূতদের সাইকোলজি বুঝি না। এখন বরং জোজোর কবিতা শোনা যাক। সেই মামার কবিতাটা।”

জোজো অমনি বলে উঠল :

“লাভলু মামার গায়ে হলদে জামা
পটাশ করে ছিঁড়ল একটা বোতাম
মাংস-মুড়ি খাচ্ছে এক ধামা
আহা, আমি যদি লাভলু মামা হতাম!”

কাকাবাবু বললেন, “বাঃ, বেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে। কিন্তু ধামা কথাটার মানে কি কেউ বুঝছে? এখন আর তেমন ব্যবহার হয় না।”

সম্ভু বলল, “আমি জানি, বুড়ির মতো একটা জিনিস। বেতের তৈরি। কিন্তু জোজো, মাংস-মুড়ি খায় কী করে?”

জোজো বলল, “কেন, মাংস দিয়ে মুড়ি খাসনি কখনও? দারুণ লাগে! আমার মামা তো প্রায়ই খান।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “খাওয়া ছাড়া তোমার মামা আর কী করেন?”

জোজো বলল, “সাঁতার কাটেন।”

কাকাবাবু বললেন, “সাঁতার কাটেন? সে তো খুব ভাল কথা। আর কিছু করেন না?”

জোজো বলল, “হ্যাঁ। সেটাই তো আসল কাজ। সাপ ধরেন।”

কাকাবাবু বললেন, “সাপ ধরেন মানে? কোথায় সাপ ধরেন?”

জোজো বলল, “সুন্দরবনে আর নর্থ বেঙ্গলে। একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানি লাভলু মামাকে এই কাজ দিয়েছে। অনেক টাকা দেয়।”

কাকাবাবু বললেন, “ওরে বাবা, সাপ ধরা তো খুব শক্ত কাজ। তোমার মামা শিখলেন কী করে?”

জোজো বলল, “আফ্রিকা থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। উনি তো সাপ ধরায় এক্সপার্ট। কত দেশ থেকে ওঁকে ডাকাডাকি করে, উনি এখন আর যেতে চান না। তার কারণ, আমাদের মতো এত ভাল মাছ তো অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ফরাসি দেশ থেকে চলে এলেন, কারণ, সে-দেশে মুড়ি পাওয়া যায় না। ওঁর প্রতিদিন মুড়ি চাইই চাই। মুড়ি দিয়েও উনি মাছ খান। তার নাম মুড়িঘণ্ট। লাভলুমামা কিন্তু সব সাপ ধরেন না। অনেক সাপ ধরে ধরেও ছেড়ে দেন। উনি শুধু ধরেন ময়াল সাপ। ফরেন কান্ট্রিতে ওই সাপেরই খুব ডিম্ভা। ময়াল সাপ কাকে বলে জানিস তো সন্তু? বাংলায় যাকে বলে পাইথন।”

সন্তু বলল, “জানি। সাপ মানে তো বাংলায় যাকে বলে স্নেক!”

বাদশা হেসে ফেলে বলল, “এটা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। বলব?”

কাকাবাবু বললেন, “বলো, বলো, গল্প শুনেই তো সময় কাটাতে হবে।”

বাদশা বলল, “এটা ঠিক গল্প নয়। ফ্যাক্ট! স্কুলে আমাদের এক মাস্টারমশাই ছিলেন, বাংলা পড়াতেন। ওঁর বাড়ি চিটাগাং। অনেক কথারই উচ্চারণ শুনে বোঝা যেত না। একদিন উনি কবিতা পড়াচ্ছেন, তার একটা লাইন ছিল, ‘মন্ত দাদুরি, ডাকে ডাহকি, ফাটি যাওত ছাতিয়া।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্যার, ‘দাদুরি’ মানে কী?’ উনি বললেন, ‘‘দাদুরি’ মানে জানো না? ভ্যাক, ভ্যাক!’ আমি তো আরও বুঝলাম না, ভ্যাক আবার কী জিনিস? স্যারের

দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকতে উনি বললেন, ‘ভ্যাক বুঝলা না? সোজা বাংলায় যারে বলে বেং!’ আমি আবার অগাধ জলে, বেং-ও কখনও শুনিনি। ক্লাসের অন্য ছেলেরা হাসছে। স্যার রেগে গিয়ে বললেন, ‘ইংরাজি না কইলে তোমরা কিছুই বুঝো না, এই তোমাগো দোষ। ওই ইংরাজিতে যারে কয় ফোগ, ফোগ! দাদুরি মানে ফোগ।’

খুব জোরে হেসে উঠলেন কাকাবাবু। সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এটা বেশ ভাল গল্প। তোরা সব বুঝলি তো?”

সন্তু বলল, “ফোগ হচ্ছে ফ্রগ, তাই না?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ। বেং হচ্ছে ব্যাং, আর ভ্যাক হচ্ছে ভেক, সেটাও ব্যাঙের আর-এক নাম।”

সন্তু বলল, “জোজোর সাপের গল্প, তারপরই এল ব্যাঙের গল্প। এর পর?”

বাদশা বলল, “কাকাবাবু, একটা ব্যাপার দেখুন, ব্যাং তো অতি সাধারণ প্রাণী, কিন্তু তার কত নাম! আরও একটা নাম আছে, মণ্ডুক।”

কাকাবাবু বললেন, “তা ঠিক। মণ্ডুক থেকে কূপমণ্ডুক। কুয়োর ব্যাং। এই কথাটা খুব ভাল। কুয়োর ব্যাং তো সারা জীবন কুয়োতেই থাকে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছু জানে না, তাই কুয়োটাকেই মনে করে পৃথিবী। অনেক মানুষও হয় এরকম।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না। আপনি আজকাল বড্ড জ্ঞান দেন। কূপমণ্ডুকের মানে না জানলে কী ক্ষতি হয়?”

কাকাবাবু বললেন, “কিছুই ক্ষতি হয় না। তুমিও কূপমণ্ডুক হয়েই থাকতে। আমি আজকাল বেশি জ্ঞান দিচ্ছি? ঠিক আছে, আর দেব না। অন্য গল্প হোক, তোমার আর কোনও মামা নেই?”

সন্তু বলল, “জোজো, কবিতা লিখতে গেলে কিন্তু অনেক কিছু জানতে হয়।”

জোজো বলল, “আমি এখন তোর চেয়েও ভাল বাংলা লিখতে শিখেছি। তুই শালপ্রাংশু মানে জানিস?”

সন্তু বলল, “জানব না কেন? শাল গাছের মতো উঁচু, কিংবা বড়।”

“আর বাসুকি?”

“সাপেদের রাজা। বিরাট লম্বা। দেবতারা যখন সমুদ্রমন্ত্ৰন করেছিলেন,

তখন মন্দার নামে একটা পাহাড়কে এই সাপটাকে দিয়ে বেঁধে সমুদ্রে ঘোরানো হয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “এই রে, আবার যে জ্ঞানের কথা এসে যাচ্ছে!”

বাদশা বলল, “আবার সেই সাপের কথা! বাসুকি আসলে একটা মস্ত বড় পাইথন, তাই না? পাইথনের আর-একটা বাংলা নাম আছে, অজগর। ছেলেবেলায় আমরা অ-আ শিখেছি, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমি খাব পেড়ে...”

কাকাবাবু বললেন, “জোজো, তোমার আর-একটা কবিতা শোনাও!”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “ইংরেজি না বাংলা?”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার যেটা ইচ্ছে। ইংরেজিই হোক।”

জোজো বলে উঠল :

*“A crow cries and a crocodile smiles
Each has a choice in different styles.”*

কাকাবাবু বললেন, “বাঃ, এটা তো আরও ভাল হয়েছে।”

সন্তু বলল, “মডার্ন কবিতা। কাক কখনও কাঁদে না, আর কুমিরও হাসে না।”

বাদশা বলল, “কুমিরের কান্না বলে একটা কথা আছে। কুস্তীরাশ্রু। সেটা কিন্তু ফল্‌স কান্না। লোক দেখানো।”

কাকাবাবু বললেন, “এই রে, এবার বাদশা জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। তবে, জোজোর এ-কবিতা কিন্তু সত্যি ভাল। একসঙ্গে বাংলা আর ইংরেজি দু’রকম কবিতাই লিখতে পারে, এটা কম কথা নয়!”

প্রশংসা শুনে জোজো বলল, “এখন একটু স্যান্ডউইচ খেলে হয় না?”

সন্তু বলল, “এর মধ্যেই? এখনও আটটা বাজেনি।”

কাকাবাবু বললেন, “ইচ্ছে হচ্ছে, ও খেয়ে নিক না। এখন কিছু খাক, পরেও আবার খাবো।”

গল্প করতে করতে আরও অনেকটা সময় কেটে গেল।

একসময় জোজো জিজ্ঞেস করল, “এখানে বাথরুম নেই? নীচে যেতে হবে?”

বাদশা বলল, “না, নীচে যেতে হবে না। বারান্দার কোণে একটা বাথরুম আছে। ওদিকটা ভাঙা নয়, চিন্তা নেই। টর্চ নিয়ে যাও।”

জোজো বলল, “ওরে বাবা, একা যেতে পারব না। সন্তু, তুই যাবি আমার সঙ্গে?”

সন্তু বলল, “চল, যাচ্ছি তোর সঙ্গে!”

ওরা দু’জনে বেরিয়ে গেল দুটো টর্চ নিয়ে।

বারান্দাটা অনেকখানি লম্বা, তার শেষে বাথরুম। দরজা খুলে জোজো বলল, “সন্তু, তুই কাছেই দাঁড়িয়ে থাক। দূরে যাবি না।”

সন্তু বলল, “ঠিক আছে।”

একটু পরেই জোজো ভিতর থেকে বলল, “এই সন্তু, তুই কী বলছিস?”

সন্তু বলল, “কিছু তো বলছি না।”

“তুই যে আমার নাম ধরে ডাকলি?”

“কই, আমি তো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।”

“এই সন্তু, আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবি না বলছি! ভাল হবে না।”

“কী মুশকিল! তোকে ভয় দেখাব কেন?”

“সন্তু, সন্তু!”

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। জোজোর মুখখানা ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে।

সে এসে সন্তুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, “সন্তু, বাথরুমের মধ্যে আর-একজন কেউ রয়েছে। কথা বলছে।”

সন্তু বলল, “আমি দেখছি।”

সন্তু নিজে বাথরুমে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। আগেকার আমলের বাথরুম। বেশ বড়। তবু টর্চের আলোয় সবটাই দেখা যায়। কেউ সেখানে লুকিয়ে বসে নেই। একটা মাত্র জানলা, তাও বন্ধ।

সন্তু বলল, “কই রে, ভিতরে তো কেউ নেই।”

জোজো বলল, “আমি স্পষ্ট শুনেছি, আমার নাম ধরে ডাকছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, তুই বুঝি...”

সন্তু বলল, “ওটা তোর মনের ভুল। আগে থেকেই ভয় পেলে এরকম হয়।”

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জোরে শোনা গেল, “হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো।”

সেই হাঁচির শব্দ শুনে সন্তু পর্যন্ত কেঁপে উঠল। শব্দটা ঠিক দরজার কাছে, অথচ কেউ নেই সেখানে।

নিজেকে সামলে নিয়ে সন্ত জিজ্ঞেস করল, “কে? কেউ আছে এখানে?”

এবারে শোনা গেল একটা অদ্ভুত গলায় গানের মতো, “আয় আয় কাছে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই!”

সন্তকে ছেড়ে দিয়ে জোজো মারল এক দৌড়।

সন্ত বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে টর্চের আলোয় দেখল বারান্দাটা। কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। তবু গলা শোনা যাচ্ছে। তবে কি সত্যিই অশরীরী?

এবার সাধারণ মানুষের মতো গম্ভীর গলায় শোনা গেল, “যত সব উটকো বামেলা। কেন আসে এরা? অ্যাঁই, তুঁই এখানে কী চাস?”

সন্ত কোনওক্রমে বলল, “কিছু না।”

আর তার সাহসে কুলোল না। সেও এবার জোরে পা চালিয়ে ফিরে গেল হলঘরে। জোজো ততক্ষণে চোখ বড় বড় করে হাত-পা নেড়ে সব বলতে শুরু করেছে।

বাদশা বলল, “বাথরুমে লোকের গলা শোনা যাচ্ছে? তা কী করে হয়? আজ সারা বাড়ি খুব ভাল করে সার্চ করে দেখা হয়েছে, কিছু নেই। বাইরে থেকেও কেউ আসতে পারবে না।”

সন্ত বলল, “আমিও তো নিজের কানেই শুনলাম।”

বাদশা বলল, “আমি দেখে আসছি নিজে।”

কাকাবাবু মিটিমিটি হাসছেন। তিনি বললেন, “যাও, কিছুই দেখতে পাবে না।”

ওরা ফিরে এল মিনিটদশেক পরে।

তিনজনেই গলার আওয়াজ শুনেছে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। কোথাও কারও লুকোনোর কোনও জায়গাই নেই। অশরীরী ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী কী বলছিল বলো তো?”

সন্ত আর জোজো দু’জনেই শুনিয়ে দিল কথাগুলো। দ্বিতীয়বার অন্য রকম কথা। দু’জন মানুষ কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, “আয় আয় কাছে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই, এটা তোমরা চিনতে পারলে না? ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ সিনেমায় ভূতের রাজার গান। যে-গানটা গেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজে। স্পেশ্যালভাবে রেকর্ড করায় গলাটা অন্যরকম শুনিয়েছে। সেই ভূতের রাজার গান এখানকার ভূতেরা শিখে নিয়েছে।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, ব্যাপারটা তা হলে কী হচ্ছে? সত্যি ভূত আছে?”

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার একটা গান শোনা গেল। প্রথমে মনে হল, অনেক দূর থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে। তারপর খুব কাছে আর জোরে। কোনও মেয়ের গলা, কিছুটা নাকি-নাকি। আবার গানের আওয়াজটা দূরে চলে গেল।

জোজো কাকাবাবুর গা ঘেঁষে এসে বলল, “ওরে বাবা, এসব কী?”

কাকাবাবু বললেন, “জোজো, তুমি ভূতের গান শুনতে চেয়েছিলে। তোমার ব্যাগে লিখে রেখেছিলে, এবার যাচ্ছি শিমুলতলায়/গান শুনব ভূতের গলায়। ভূতেরা সেটা পড়ে নিয়ে তোমায় গান শোনাচ্ছে।”

গানটা আবার শোনা গেল বেশ কাছে। একবার ডান দিক থেকে, পরে একবার বাঁ দিকে। কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেকটা এই রকম :

ভুলভুলাইয়া ঘ্যাঙোর ঘ্যাং,
ছঁররা মঁরি ঘুমের গাড়ি,
কঁড়কঁড়াত ফঁরফড়াত,
আঁমার বাড়ি, আঁমার বাড়ি,
যা রে ছাঁড়ি যারে ছাঁড়ি...

কাকাবাবু বললেন, “ভূতের গান হিসেবে খুব সুবিধের নয়। ওগো মেয়ে, আর-একটা ভাল গান শোনাও না!”

গানটা হঠাৎ থেমে গেল।

বাদশা ব্যাকুলভাবে বলল, “কাকাবাবু, এসব কী হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ আপনি হালকাভাবে নিচ্ছেন। আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন প্লিজ! গানটা কোথা থেকে আসছে।”

কাকাবাবু বললেন, “বোঝাতে গেলে যদি জ্ঞানের কথা হয়ে যায়?”

জোজো কাকাবাবুর একটা হাঁটু ধরে বলল, “কাকাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন ওই কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। হঠাৎ বলে ফেলেছি!”

সন্ত কড়া গলায় বলল, “এই জোজো, কান ধর!”

কাকাবাবু জোজোকে বুকে টেনে নিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “না, না, ওসব কিছু করতে হবে না। জোজোকে আমি কত ভালবাসি। ওর যা মনে এসেছে, তাই তো বলেছে। বলবে না কেন? মুশকিল

হচ্ছে কী, আমি তোদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই মিশতে চাই। কিন্তু আমার বয়স যে অনেক বেশি! তাই মাঝে মাঝে ওসব কথা বেরিয়ে আসে। মনে হয়, আমি যা জানি, তা তোদেরও জানা উচিত।”

বাদশা বলল, “আমাদের সেসব শুনতে ভাল লাগে। এখন কী হচ্ছে, আপনি বলুন।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, তা হলে এসব কিছুই অলৌকিক বলে মনে হয় না। সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যদি মানুষের কথা শোনা যায়, কিংবা গান ভেসে আসে, অথচ কাউকে চোখে দেখা যায় না, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কোনও কারণ নেই তো?”

জোজো বলল, “বাথরুমে একজন আমার নাম ধরে ডাকল, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ সে আমাকে দেখছে!”

কাকাবাবু বললেন, “না, তা নয়। মনে করো, তুমি ঘরে বসে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনছ। তা বলে কি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেখানেই বসে থাকতে হবে? কত লোকই তো আলাদা আলাদা জায়গায় বসে তাঁর গান শোনে।”

বাদশা বলল, “সে তো রেডিয়ো-টিভিতে, কিংবা ক্যাসেট প্লেয়ারে। আমরা অনেক খুঁজে দেখেছি, সেরকম কিছু নেই।”

কাকাবাবু বললেন, “নেই, কিন্তু আছে।”

জোজো বলল, “ফিসফাস কথা, গানটা একবার কাছে, একবার দূরে...”

কাকাবাবু বললেন, “এসব স্পেশ্যালভাবে রেকর্ড করা যায়। এইসব পুরনো বাড়িতে ঘুলঘুলি থাকে। স্কাইলাইট থাকে। এখনকার বাড়িতে এসব থাকে না বলে জোজোরা দেখেনি।”

সন্তু বলল, “আমি নর্থ ক্যালকাটায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছি। এই তো এই হলঘরেও রয়েছে, অনেক উপরে, একটা-দুটো-তিনটে স্কাইলাইট।”

কাকাবাবু বললেন, “বারান্দাতেও ঘুলঘুলি আছে। যেখানে চড়াই পাখি আর শালিক পাখিরা বাসা করে। এই স্কাইলাইট-ঘুলঘুলিতে নিশ্চয়ই কয়েকটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার লুকোনো আছে। রিমোট কন্ট্রোলে কিংবা টাইমার দিয়ে সেগুলো চালু করাও শক্ত কিছু নয়।”

বাদশা খুব অবাক হয়ে বলল, “ক্যাসেট প্লেয়ার লুকোনো আছে? কে রাখল? চেক করে দেখতে হবে তো!”

কাকাবাবু বললেন, “একটা মই পেলে আমি এখনই প্রমাণ করে দিতে পারি।” তারপর একটু থেমে, একগাল হেসে বললেন, “আমি কিন্তু আজ রাতেই অন্তত একটা ভূত ধরে দিতে পারি।”

বাদশা দুই ভুরু তুলে বলল, “ভূত ধরে দিতে পারেন? কী করে...”

কাকাবাবু তাঁর একটা আঙুল বাদশার বুকে ছুঁয়ে বললেন, “এই যে! এসব গানটান তোমারই কীর্তি। তুমি রেকর্ড-ক্যাসেটের ব্যবসা করো, এসবের নানান কায়দাকানুনও তোমার জানা। আই অ্যাম শিয়োর, তোমার ওই লম্বা পাঞ্জাবির দু’পকেটে কয়েকখানা রিমোট কন্ট্রোল আছে। সন্ত, ওর পকেট সার্চ করে দ্যাখ তো!”

বাদশাও এবার হেসে ফেলে বলল, “থাক, সার্চ করতে হবে না। সত্যি কাকাবাবু, আপনার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি সকালবেলায় তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কখনও অভিনয় করেছ কিনা। তোমার ব্যবহার দেখে তখনই আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমাদের সঙ্গে যেন অভিনয় করে চলেছ। তা চালিয়ে গিয়েছ এতক্ষণ পর্যন্ত। কী ব্যাপার বলো তো? কেন এই ভূতের নাটক করলে আমাদের নিয়ে?”

বাদশা বলল, “আসল ব্যাপার কী জানেন, কাল দুপুরেই এ-বাড়ির ভূতেরা ধরা পড়ে গিয়েছে।”

সন্ত বলল, “ভূতেরা ধরা পড়ে গিয়েছে? তার মানে?”

বাদশা বলল, “বুঝতেই পারছ, আসল ভূত নয়। তোমরা তো এসে পৌঁছোলে কাল সন্ধ্যাবেলা! তার আগেই দুপুরবেলা চারটি ছেলে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। তাদের একটা গোপন পাটি আছে। তারা মাঝে মাঝেই রাতে সিটিং করত এই বাড়িতে। অন্য কেউ যাতে না জানতে পারে, সেই জন্যই তারা নানারকম ভূতের খেলা দেখাত। ভয়ে আর কেউ এদিকে আসত না। কাকাবাবু যে এখানে আসছেন, তা তারা জানতে পেরে গিয়েছিল। আমার কাছে গিয়ে সব স্বীকার করে তারা বলল, ‘রাজা রায়চৌধুরী আসছেন, ওঁর কাছে তো ভূতের জারিজুরি খাটবে না। উনি ঠিক ধরে ফেলবেন। ওঁকে মেরে ফেলতেও চাই না আমরা।’ ”

কাকাবাবু বললেন, “চাইলেই বুঝি আমাকে মেরে ফেলা যায়?”

বাদশা বলল, “ওদের মধ্যে দুটো ছেলে আপনার ভক্ত। সেই জন্যই আপনাকে মারার চেষ্টাও করবে না। মোট কথা, কালই আমাকে ওরা বলল,

এই বাড়িটা ওরা ছেড়ে দিচ্ছে। ওরা অন্য বাড়ি খুঁজে নেবে। তার বদলে ওরা কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা চাইল। আমি কুড়ি হাজার দিইনি। তবে ভবিষ্যতে ওরা আর গোলমাল করবে না, এই শর্তে দিয়েছি দশ হাজার। এদিকে আপনাদের এখানে আসতে বলেছি। তখন তো আর খবর দেওয়ার উপায় নেই। ততক্ষণে আপনারা ট্রেনে চেপে গিয়েছেন। তাই ভাবলাম, আপনারা এখানে খাবেনদাবেন, বেড়াবেন, আর খানিকটা ভূত ধরার উদ্ভেজনাও হবে। তাই এসব সাজিয়েছিলাম। কিন্তু কাকাবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।”

জোজো হতাশভাবে বলল, “যাঃ, তা হলে আর এবারেও ভূত দেখা হল না? কোনওদিনই কি ভূত দেখতে পাব না?”

কাকাবাবু বললেন, “পাবে, পাবে। যেখানে আমি থাকব না, সেখানে ভূত দেখতেও পারো। খাঁটি ভূতেরা আমার সামনে আসতে লজ্জা পায়।”

জোজো বলল, “তা হলে আর এখানে শুধু শুধু রাত জেগে কী হবে? বাদশাদার বাড়িতে গিয়ে নরম বিছানায় শুয়ে পড়লেই হয়।”

সন্তু বলল, “না, না। আমার এখানেই বেশ ভাল লাগছে। ভূত না-ই বা দেখা হল, তা হলেও সকলে মিলে বেশ গল্প করা যাবে।”

বাদশা বলল, “আমারও মনে হয়, রাতটা সকলে মিলে এখানে আড্ডা দিয়ে কাটালেই ভাল হবে। এখানকার লোকেরা বুঝবে, ভূতেরা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আমাদের দেখে ওদেরও কিছুটা ভয় ভাঙবে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “ওই ভূতের গানটা কে লিখেছে?”

বাদশা লাজুক মুখ করে বলল, “আমি।”

“ওই একখানাই? না, আরও রেকর্ড করা আছে?”

“আরও দু’খানা আছে।”

“তা হলে সেগুলোও চালাও। শুনে দেখি।”

“ঠিক আছে। তার আগে আমরা স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে নিই? এখনও অনেক রাত বাকি।”

বাদশা স্যান্ডউইচের প্যাকেটগুলো খুলতে খুলতে বলল, “কাপে কফি ঢেলে ফেলো তো সন্তু!”

এমন সময় ছাদে দুমদুম আওয়াজ হল।

কাকাবাবু বললেন, “আবার মেঘ গজরাচ্ছে বুঝি?”

সন্তু বলল, “ঝড়-বৃষ্টি তো অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে।”

জোজো উঠে গিয়ে একটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, “আকাশ পরিষ্কার। আর মেঘ নেই।”

আবার ছাদে দুমদুম শব্দ হল, এবার আরও জোরে।

চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। তার মধ্যে ছাদের উপরের দুমদুম শব্দ আচমকা বুক কাঁপিয়ে দেয়।

ছাদের উপর সেই শব্দ হতেই কয়েক মুহূর্ত এরা সকলে চুপ করে রইল।

তৃতীয়বারও সেই শব্দ হওয়ার পর বাদশা পাংশু মুখে বলল, “এটা কীসের আওয়াজ আমি বুঝতেই পারছি না। কাকাবাবু, বিশ্বাস করুন, ছাদে আমি কোনওরকম ভয় দেখাবার ব্যবস্থা করিনি।”

সন্তু বলল, “কোনও চোরটোর এলেও শুধু শুধু শব্দ করবে কেন? জন্তুজানোয়ার হতে পারে। বাঁদর আসে?”

কাকাবাবু বললেন, “কোনও বাঁদর এত জোরে শব্দ করতে পারে নাকি?”

জোজো বলল, “একমাত্র গন্ডার হওয়া সম্ভব!”

কাকাবাবু বললেন, “ছাদের উপর গন্ডার! চমৎকার আইডিয়া!”

আবার সেই শব্দ।

বাদশা রীতিমতো ভয় পেয়ে বলল, “এ যে মনে হচ্ছে ছাদটা ভেঙে ফেলবে! এখন আমরা কী করব?”

কাকাবাবু বললেন, “ছাদে কেন এত শব্দ হচ্ছে, তা জানার একমাত্র উপায় ছাদে গিয়ে দেখে আসা। সিঁড়ি আছে?”

বাদশা বলল, “হ্যাঁ আছে। চলুন, আমরা সকলে মিলে দেখে আসি।”

কাকাবাবু বললেন, “সকলে মিলে কেন? তা হলে মনে হবে, আমরা ভয় পেয়েছি। ভয়টাকে মানলেই ভয় আরও বেড়ে যায়। তোমরা বসো, আমি দেখে আসছি।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, তুমি যাবে কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তোমার অসুবিধে হবে, আমি যাচ্ছি।”

বাদশা বলল, “না, না, সন্তু। আমিই যাচ্ছি। আমি দেখে আসছি।”

সন্তু তবু বলল, “আমি যাব।”

বাদশা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “তা কখনও হয়! আমার বাড়ি, দায়িত্ব আমার। সঙ্গে তো রাইফেল থাকছেই। চোর-ডাকাত যদি হয়, গুলি করে মাথা উড়িয়ে দেব।”

সে আর দেরি না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অন্য তিনজন বসে রইল উৎকর্ষ হয়ে।

একসময় জোজো ফিসফিস করে বলল, “কাকাবাবু তো বলে দিয়েছেন ভূত নেই। তাই শুনে আসল ভূতরা রেগে গিয়েছে। নিজেদের জানান দিচ্ছে।”

সন্তু বলল, “ভূতেরা বুঝি দুমদুম শব্দ করে?”

জোজো বলল, “ব্রহ্মদৈত্য হতে পারে।”

বাদশা ফিরে এল একটু পরেই। ফ্যাকাশে মুখে বলল, “কেউ নেই, কিছু নেই উপরে।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কিছুই দেখতে পেলেন না?”

বাদশা বলল, “আমি ছাদের চারপাশটা দেখে এলাম। কোনও কিছুই চিহ্নই নেই।” তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে হাত জোড় করে বলল, “আপনি বিশ্বাস করুন কাকাবাবু, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না।”

কাকাবাবু বললেন, “পুরনো বাড়ির ছাদ, নানারকম শব্দ হতেই পারে। গরমকালে বোধহয় খানিকটা এক্সপ্যানশন হয়, তাতে অনেকটা গু-ডু-র গু-ডু-র শব্দ হয়। কিন্তু এরকম তো...”

আবার দুমদুম শব্দ! কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ছাদটা ভাঙার চেষ্টা করছে।

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, “আমি একবার দেখে আসবই আসব।”

বাদশা বলল, “আমার রাইফেলটা নিয়ে যাও!”

সন্তু বলল, “আমি রাইফেল চালাতে জানি না। কাকাবাবু, তোমার রিভলভারটা দাও!”

সেটা নিয়ে সন্তু দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

রেলিং নেই বটে, কিন্তু সিঁড়িটা ভাঙা নয়। উপরের দরজাটা হাট করে খোলা।

ছাদে এসে সন্তুও প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না। ফাঁকা ছাদ, একটা-দুটো ঝাঁকড়া গাছ দেখা যায়, উঠেছে পাশ দিয়ে। ছাদটা দু’ভাগে ভাগ করা। অন্য দিকটাই একেবারে ভেঙে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়েও কিছু দেখা গেল না।

তারপর একটা গাছে বেশ জোরে শব্দ হতেই সন্তু সেদিকে ফিরে তাকাল।

সেই গাছ থেকে একজন কেউ হাত বাড়িয়ে ধরল ছাদের কানিশ। মনে হল, একটা গোরিলা। যতই অবিশ্বাসী হোক, রাত্তিরবেলা নির্জন ছাদে এরকম অদ্ভুত কিছু দেখলে বুকটা কেঁপে উঠবেই। বুক কাঁপলেও সন্তু শক্ত করে রিভলভারটা চেপে ধরে রইল। গোরিলা যদি হয়, তা হলে তো রিভলভার থেকেও কোনও লাভ নেই। গুলি করলে আরও বিপদ হবে।

গোরিলা নয়, মানুষ!

কানিশ পেরিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিশাল লম্বা-চওড়া পুরুষ, প্যান্ট-কোট পরা, মাথায় একটা টুপি। মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। অনেক গল্পের বইয়ে সাহেব-ভূতদের এরকম ছবি থাকে।

তাড়াতাড়িতে সন্তু টর্চটা আনতে ভুলে গিয়েছে। ভূতের ভয় তার একেবারেই নেই। মানুষ যখন, তখন আর ভয় পাওয়ার কী আছে? বুকের কাঁপুনিটা থেমে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কে? কে ওখানে?”

ছায়ামূর্তি ইংরেজিতে বলল, “ইউ গো ব্যাক। কল মিস্টার রায়চৌধুরী।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “হু আর ইউ?”

সে এবার বাংলায় গম্ভীরভাবে বলল, “তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। যাও, তোমার আঙ্কলকে ডাকো।”

সন্তু বলল, “আমার আঙ্কল যার-তার সঙ্গে দেখা করেন না। আপনি কে আগে বলুন!”

সে এবার বিচ্ছিন্নি কর্কশভাবে বলল, “এ যে দেখছি একটা নেংটি ইঁদুর। যা যা, নীচে যা। তোমার আঙ্কলকে গিয়ে বল, আমি ভূত!”

সন্তু বলল, “আপনার পরিচয় না দিলে আমি গুলি চালাব। সত্যি ভূত কিনা দেখব।”

সে এবার বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলল, “তুই আবার গুলি চালাতেও শিখেছিস নাকি? চালা তো দেখি।”

সন্তু ট্রিগার টিপল। লোকটাকে ঠিক মারার জন্য নয়, ভয় দেখানোর জন্য। মাথার উপর দিয়ে গেল গুলিটা।

সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গুলি চালান দু'বার। সন্তুর বুকো। সন্তু পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটি আবার ছাদের পাঁচিল উপকে নেমে গেল গাছ বেয়ে।

নীচের ঘরে কাকাবাবুরা পরপর তিনবার গুলির শব্দ শুনতে পেলেন। বাদশা লাফিয়ে উঠে বলল, “অ্যা? গুলি!”

সে ছুটে যেতেই জোজোও গেল তার পিছনে পিছনে।

কাকাবাবুর ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে একটু দেরি হল।

তিনি দরজার কাছে আসতেই জোজো ডুকরে উঠে বলল, “কাকাবাবু, কাকাবাবু, সন্তু মরে গিয়েছে!”

কাকাবাবু কেঁপে উঠে বললেন, “অ্যা? কী বলছ জোজো? না, না, এ হতেই পারে না!”

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, উপুড় হয়ে পড়ে আছে সন্তু। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ।

বাদশা তার শরীরটা উলটে দিল। সন্তুর বুক থেকে এখনও গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

বাদশা সন্তুর নাড়ি ধরে বসে রইল।

কাকাবাবু পাগলের মতো বলতে লাগলেন, “কী, বাদশা? কী? শুনতে পাচ্ছ কিছু? বাদশা!”

বাদশা হতাশভাবে বলল, “সাড়া নেই। নিশ্বাসও টের পাচ্ছি না।”

কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ভাঙা গলায় বললেন, “সন্তু, সন্তু নেই? অ্যা? অ্যা? কী বলছ বাদশা। মিথ্যে কথা। সন্তু নেই!”

বাদশা বলল, “কাকাবাবু, এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়। এখনই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যদি কিছু আশা থাকে।” তারপর জোজোকে বলল, “তোমাকেও শব্দ থাকতে হবে। পা দুটো ধরো ওর। গেটের সামনে গাড়ি আছে। কাকাবাবু, আপনি আস্তে আস্তে নামুন। তাড়াহুড়ো করে হোঁচট খাবেন না, তাতে আরও বিপদ হবে।”

বাদশা আর জোজো সন্তুকে বয়ে নিয়ে গেল নীচে।

কাকাবাবু সাবধানে সিঁড়িতে পা ফেলতে লাগলেন। তাঁর দু’চোখ ঠেলে আসছে কান্না। এক জায়গায় তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভূত কখনও মানুষকে গুলি করে না। সাধারণ চোর-ডাকাত কিংবা পার্টির ছেলেরাই বা শুধু শুধু সন্তুকে মারতে যাবে কেন? এ নিশ্চয়ই সেই কর্নেল ধ্যানচাঁদের কাজ। ওরা এমনই নিষ্ঠুর! বাদশা যখন ছাদে উঠল, তখন তো তাকে গুলি করেনি। ওরা নিশ্চয়ই সন্তুকে চিনতে পেরেই মেরেছে।

ইস, কেন তিনি সন্তুকে কর্নেল ধ্যানচাঁদের হুমকির কথা বলে দেননি।

তা হলে সন্তু সাবধান হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু এইরকম ভূতের বাড়িতে ওরা আক্রমণ করতে আসবে, তা কাকাবাবু ভাবতেই পারেননি। এটা তাঁরই ভুল। ধ্যানচাঁদ লোকটা হঠাৎ-হঠাৎই আসবে বলেছিল। সন্তুকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। সন্তু না থাকলে তাঁরও আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে না। ধ্যানচাঁদই জিতে গেল।

বাদশা আবার উঠে এসে কাকাবাবুর হাত ধরে বলল, “নামুন, আমার কাঁধে ভর দিন।”

কাকাবাবু চোখ মুছে ফেললেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। মনে মনে কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি।

শিমুলতলায় একজন ডাক্তার বাদশার বন্ধু। প্রথমে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল।

তিনি দেখে বললেন, “বাঁচবার আশা খুব কম। তবে এখনও প্রাণ আছে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। কয়েক বোতল রক্ত দিতে হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “সন্তু আর আমার ব্লাড গ্রুপ একই। আমার শরীর থেকে যত ইচ্ছে রক্ত নি।”

ডাক্তারটি বললেন, “সেসব ব্যবস্থা তো এখানে নেই। জসিডি নিয়ে যেতে হবে। কিংবা দেওঘর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।”

কাকাবাবু কাতরভাবে বললেন, “আপনি দয়া করে আমাদের সঙ্গে চলুন।”

ডাক্তার ভার্গব বললেন, “নিশ্চয়ই যাব।”

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটল জসিডির দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে বাদশা নিজে, দারুণ স্পিডে। সন্তুকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কাকাবাবুর কোলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জোজো।

ডাক্তার ভার্গব বললেন, “বাদশা, অত জোরে চালাচ্ছ, অ্যাকসিডেন্ট হলে তো সকলকে মরতে হবে। তাতে কী লাভ হবে!”

বাদশা বলল, “আমি ঠিক দেখে চালাচ্ছি।”

এখন অনেক রাত, জসিডি হাসপাতালে কয়েকজন নার্স শুধু ডিউটি দিচ্ছেন। কোনও ডাক্তার নেই।

সন্তুকে ভরতি করানো হল এমার্জেন্সিতে। এখনই অপারেশন করা দরকার। কিন্তু ভার্গব অপারেশন করেন না, তিনি পেটের রোগের চিকিৎসা করেন।

ডাক্তার ভার্গবকে সস্তুর পাশে বসিয়ে রেখে আবার ছুটে বেরিয়ে গেল বাদশা। এই হাসপাতালের ডাক্তার জয়ন্ত দাসকে সে চেনে। তাঁর বাড়ি কোথায় তাও জানে।

কাকাবাবু চেয়ে রইলেন সস্তুর দিকে। রক্তমাখা শরীর, চোখ দুটো বোজা। বেঁচে থাকার কোনও চিহ্নই নেই। জোজো দু’হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

দু’জন নার্স এলেন সস্তুর গায়ের রক্তটুকু পরিষ্কার করতে।

একজন বললেন, “আহা গো, এই বয়সের ছেলেকে কে এমন করে মারলে?”

অন্যজন বললেন, “আজকাল তো এই রকমই হয়েছে। কারও দয়ামায়া নেই।”

প্রথমজন ডাক্তার ভার্গবকে জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, একে বাঁচানো যাবে?”

ডাক্তার ভার্গব বললেন, “আশা তো করতেই হবে।”

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাদশা টানতে টানতে নিয়ে এল অন্য একজন ডাক্তারকে। তাঁর মাথার চুল উসকোখুসকো, পাজামা আর গেঞ্জি পরা।

বাদশা বোধহয় ওঁকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এনেছে, জামাও পরতে দেয়নি, চুল আঁচড়াবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি সস্তুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ঘরের অন্যদের। মুখখানা গম্ভীর।

ডাক্তার ভার্গব বললেন, “খুব মৃদু পাল্‌স পাওয়া যাচ্ছে এখনও।”

বাদশা বলল, “কাকাবাবু, ডাক্তার জয়ন্ত দাস খুব নামী সার্জন।”

ডাক্তার দাস বললেন, “আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কী হবে জানি না। আপনারা সকলে বাইরে অপেক্ষা করুন, এখানে ভিড় করে থেকে লাভ নেই।”

এরপর চারদিনের মধ্যেও সস্তুর জ্ঞান ফিরল না।

ডাক্তার জয়ন্ত দাস ছাড়াও আরও তিনজন স্থানীয় ডাক্তার দেখছেন তাকে। সস্তুর পেট থেকে একটা গুলি বের করা গিয়েছে। আর-একটা বের করতে তাঁরা সাহস পাচ্ছেন না। হার্টে খোঁচা লেগে যাওয়ার ভয় আছে।

এই চারদিনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে জোজোর। সকলে মিলে একটা গেস্ট হাউজে থাকছেন এই ক’দিন। সব ব্যবস্থা বাদশাই করছে। জোজো এর মধ্যে কিছুই খাচ্ছে না, একটা কথাও বলছে না। কাকাবাবু তবু মাঝে মাঝে শুধু টোস্ট আর কফি খাচ্ছেন। জোজো কোনও খাবারই মুখে দেবে না। বাদশা অনেক চেষ্টা করেছে, তবু জোজো কিছু ছোঁবে না।

কাকাবাবুও তাকে বলেছেন, “জোজো, একটু কিছু খাও। শুধু শুধু তোমার শরীরও খারাপ করে তো লাভ নেই।”

জোজো শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে কাকাবাবুর দিকে। দু’চোখের নীচে শুকনো জলের রেখা। মুখে কোনও শব্দ নেই। কাকাবাবুর অনুরোধেও সে কিছু খায়নি।

চারদিন পর ডাক্তার জয়ন্ত দাস বললেন, “কাকাবাবু, এখানে আমরা যত দূর সাধ্য করেছি। এখানে অনেক যন্ত্রপাতি নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে?”

ডাক্তার দাস বললেন, “ট্রেনে নিয়ে যান। খুব সাবধানে। সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকলে ভাল হয়।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে আপনিই চলুন, অনুগ্রহ করে। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।”

জয়ন্ত দাস বললেন, “ওরকম করে বলছেন কেন? আমরা কি আপনার কথা, সন্তুর কথা জানি না? সন্তু কত অভিযানে আপনার সঙ্গী হয়েছে। সন্তুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে আমাদের ডাক্তারি শেখা সার্থক হবে। কিন্তু এখানে আর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। গুলিটা এমন বিশ্রী জায়গায় আটকে আছে! আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।”

আগেই টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা ছিল। হাওড়া স্টেশন থেকেই সন্তুকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল পি জি হাসপাতালে। এখানে অনেকেই কাকাবাবুর জানা। তখনই ডাক্তারদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

ঘণ্টা দু’-এক বাদে এই হাসপাতালের সুপার ডাক্তার রফিকুল আহমেদ কাকাবাবুকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, “কাকাবাবু, আপনি এখন বাড়ি যান। কিংবা আমার কোয়ার্টারে গিয়েও বিশ্রাম নিতে পারেন। শুধু শুধু হাসপাতালে বসে থাকবেন কেন? পেশেন্টের যা অবস্থা, এখনই অপারেশন

করা যাবে না। একদিন-দু'দিন অন্তত অবজারভেশনে রাখতে হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “রফিকুল, একটা সত্যি কথা বলো তো? সম্ভব বেঁচে থাকার চান্স কতখানি?”

ডাক্তার আহমেদ বললেন, “সত্যি কথাই তো বলতে হবে। পাঁচ জন ডাক্তারকে নিয়ে একটা মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য আনঅফিশিয়ালি। এর চেয়ে ভাল চিকিৎসা আর এদেশে সম্ভব নয়। কিন্তু কাকাবাবু, খুবই দুঃখের কথা, এখনও পর্যন্ত সম্ভব যা কন্ডিশন, তাতে ওর না-বাঁচার সম্ভাবনাই নাইনটি পার্সেন্ট!”

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, “তাও তো এখনও টেন পার্সেন্ট আশা আছে। তাই না?”

ডাক্তার আহমেদ বললেন, “তা ঠিক।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি আশাবাদী। তোমরা শেষ চেষ্টা করো।”

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু একটা ট্যাক্সি নিলেন। সঙ্গে জোজো। সে এখনও কথা বলছে না।

কাকাবাবু জোজোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, “জোজো, এত ভেঙে পড়লে চলবে না। ডাক্তাররা বলেছেন, এখনও আশা আছে। আমরা আশা রাখব। তার জোরেই সম্ভব বেঁচে থাকা হবে।”

জোজোকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে কাকাবাবু ট্যাক্সিটা ঘোরাতে বললেন।

এই ক’দিন অন্য কিছু চিন্তা করার সময় পাননি। এখন তাঁর মনে পড়ল সেই কর্নেল ধ্যানচাঁদের কথা। সে নিজেই সম্ভব গুলি করেছিল, না কোনও খুনিকে পাঠিয়েছিল? ওরা নিশ্চয়ই এখনও তাঁকে অনুসরণ করছে। এই ট্যাক্সির পিছনে ওদের গাড়ি আছে? ধ্যানচাঁদ বলেছিল, সে দিল্লি ফিরে যাবে। সেটা বাজে কথা। লড়াইটা হ’মাস চলার কথা। সে প্রথম দিনেই আঘাত হানতে এসেছিল।

হঠাৎ কাকাবাবু একটা অদ্ভুত কাজ করলেন।

ট্যাক্সিটা ময়দানের মধ্যে দিয়ে আসছে, রেড রোডের কাছে এসে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, “এখানে থামাও!”

ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ অবাক। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি এখানে নামবেন? এই অন্ধকারের মধ্যে?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, এখানে আমার দরকার আছে।”

তিনি ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তারপর নেমে গেলেন পাশের অন্ধকার মাঠে।

ওরা যদি তাঁকে অনুসরণ করে থাকে, তা হলে আসুক এখানে। সামনাসামনি লড়াই হোক। একটা হেস্টনেস্ট হয়ে যাক। সামনাসামনি লড়াই হলে কেউ তাঁকে মারতে পারবে, এটা কাকাবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। ধ্যানচাঁদ তো বলেছিল, সামনাসামনি লড়াই হবে, পিছন থেকে আক্রমণ করবে না। কই, আসুক এখানে!

রাস্তার ধারের পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। ও কে? সেই লায়লা নাকি? না, এ-মেয়েটি একটু বেশি লম্বা।

একটু পরেই সে মেয়েটি চলে গেল। দূর থেকে হেঁটে আসতে আসতে একটা লোক সেখানে দাঁড়াল সিগারেট ধরাবার জন্য। প্যান্ট-কোট পরা। এ কি ধ্যানচাঁদ? হ্যাঁ, তাই মনে হয়। লোকটি লাইটর জ্বেলে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, আর বারবার নিভে যাচ্ছে।

কাকাবাবু চৈচিয়ে বললেন, “এই যে ধ্যানচাঁদ, আমি এখানে।”

লোকটি মুখ তুলে একবার তাকাল, আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর সিগারেটটা ধরিয়েই সে হাঁটতে শুরু করে দিল সামনের দিকে।

কাকাবাবু আবার চৈচিয়ে উঠলেন, “কোথায় ধ্যানচাঁদ? এসো, তোমার লড়াইয়ের সাধ এবার মিটিয়ে দেব।”

প্রায় আধ ঘণ্টা কাকাবাবু সেখানে রইলেন, কেউ এল না। এবার কাকাবাবু বুঝলেন, কেউ তাঁকে হাসপাতাল থেকে অনুসরণ করেনি।

বড় রাস্তায় এসে তিনি খানিক পরে একটা ট্যাক্সি পেয়ে চলে এলেন বাড়িতে।

কাল বাড়িতে আর সকলে খবর পেয়ে গিয়েছেন। সন্তুর বাবা আর মা ঘুরে এসেছেন হাসপাতাল থেকে।

কাকাবাবু একতলায় বসবার ঘরে সন্তুর বাবার সামনে বসে পড়ে তাঁর হাঁটু চেপে ধরে বললেন, “দাদা, আমার ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই। সন্তু আমার সঙ্গে গিয়েছিল বলেই এরকম বিপদ হল। এখন কী হবে?”

সন্তুর বাবা বললেন, “আরে রাজা, তুই এরকম করছিস কেন? তুই তো জোর করে নিয়ে যাসনি। সন্তু ইচ্ছে করেই তোর সঙ্গে যায়। ও এইসব ভালবাসে। আমরা কোনওদিন ওকে বাধা দিইনি। লেখাপড়াতেও ফাঁকি দেয় না, ভাল রেজাল্ট করে।”

সন্তুর মা বললেন, “তোমরা তো গেলে ভূত দেখতে। হঠাৎ গুলিটুলি করল কে? ভূতে কি গুলি করে?”

কাকাবাবু বললেন, “না, গুলি করেছে আমার কোনও এক শত্রু।”

সস্তুর মা বললেন, “তুমি তো অনেক শত্রু মাথায় নিয়ে ঘোরো। কেন যে যাও ওসব করতে। আমার মন বলছে, সস্তু ঠিক বেঁচে যাবে। আমি ওর জন্য পুজো দেব।”

কাকাবাবু বললেন, “মায়ের মন, তুমি যখন বলছ, সেটাই সত্যি হবে। আমাদের সকলের ইচ্ছেশক্তিই সস্তুকে বাঁচিয়ে তুলবে।”

এরপর দিনের পর দিন চলল, যাকে বলে, যমে-মানুষের লড়াই। এক-এক দিন ডাক্তাররা বলেন, আর আশা নেই। পরের দিনই ডাক্তাররা আবার বলেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

এগারো দিন পর সস্তু প্রথম চোখ খুলল।

ডাক্তার আহমেদ এসে কাকাবাবুকে সেই খবর দিয়ে বললেন, “এখনও আপনারা ভিতরে যেতে পারবেন না। পেশেন্ট কথা বলার অবস্থায় নেই। আর-একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি কাকাবাবু, সস্তু চোখ মেলেছে বলেই খুব বেশি কিছু আশা করবেন না। কোমা থেকে ফিরে এলে দু’-একদিন ভাল থাকে, কথাটথা বলে। মনে হয়, একেবার ভাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারপরই আবার...। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, জানেন তো?”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এখনও কত পার্সেন্ট আশা করা যায়?”

ডাক্তার বললেন, “ওই বড়জোর দশ পার্সেন্ট।”

কাকাবাবু বললেন, “তাই যথেষ্ট। আমি এখনও আশাবাদী। সস্তু বেঁচে উঠবেই।”

ডাক্তার বললেন, “আমিও তাই প্রার্থনা করছি!”

সেদিন মাঝ রাত্তিরে কাকাবাবুর ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

গম্ভীর গলায় একজন বলল, “কী রাজা রায়চৌধুরী, ভয় পেয়ে গেলেন? আপনার ভাইপোকে মেরেছি বলে এখন বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন? খেলাটা আর চালিয়ে যাওয়ার সাহস নেই? আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি ফোন করে ভাল করেছে। আমি তোমাকেই খুঁজছি। আমার ভাইপো এখনও মরেনি, সে বেঁচে উঠবে। তবু, তুমি তাকে

মারতে চেয়েছিলে, এর জন্য শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। চলে এসো সামনাসামনি, আমি তোমাকে শেষ করে দেব।”

কর্নেল হা হা করে হেসে বলল, “এই তো আসল পরিচয়টা বেরিয়ে এসেছে এবার। তুমি বলেছিলে খুব বড়াই করে যে, তুমি মানুষ মারতে চাও না!”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, বলেছিলাম, এখন মত পালটে ফেলেছি। তোমার মতো যারা মানুষের বেশে শয়তান, তাদের মেরে ফেলাই উচিত। তুমি পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকো, ঠিক প্রতিশোধ নেব।”

কর্নেল আবার হেসে বলল, “তোমার ভাইপোর জন্য তুমি খেপে গিয়েছ। এখন বুঝতে পারছ তো, আমার নির্দেশ ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমার কত কষ্ট হয়েছে? আমি কেন প্রতিশোধ নিতে চাইছি?”

“আমি বারবার বলেছি, তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। আমি তাকে চোখেও দেখিনি। আর তুমি একটা নির্দেশ ছোট ছেলেকে গুলি করে মারতে গেলে? আবার হাসছ? তুমি সত্যিই একটা নরপশু!”

“তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছ, রায়চৌধুরী! শত্রু হচ্ছে শত্রু, তার আবার ছোট-বড় কী? শত্রুর হাতে অস্ত্র থাকলে তাকে প্রথম সুযোগে মেরে ফেলাই নিয়ম। তবু আমি তোমার ভাইপোকে তিনবার সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ‘তুই নীচে চলে যা। তোর কাকাকে ডেকে দো’ সে শোনেনি, সে-ই প্রথম আমার দিকে গুলি চালিয়েছে।”

“সন্তু প্রথম তোমার দিকে গুলি চালিয়েছে?”

“আলবাত! ওর যদি জ্ঞান ফেরে জিজ্ঞেস করো। শুধু শুধু ওর হাতে অস্ত্র দিয়েছিলে কেন? গুলি চালাতেই জানে না, টিপ নেই একটুও। গুলিটা আমার মাথার অনেকখানি উপর দিয়ে গিয়েছে।”

“সন্তুর হাতের টিপ দুর্দান্ত। ও হচ্ছে করেই তোমাকে মারেনি। শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিল।”

“হা-হা-হা-হা। আমাকে ভয় দেখাবে! আমাকে?”

“অত কথার দরকার নেই। কাল ভোরেই কিংবা সন্কেবেলা ময়দানে চলে এসো। ডুয়েল হোক। তোমার লড়াইয়ের শখ আমি মিটিয়ে দেব!”

“ময়দানে আমি তোমার সঙ্গে লড়তে যাব? তুমি আগে থেকে পুলিশকে খবর দিয়ে রাখবে। পুলিশ এসে আমায় ধরবে! আমি কি এত বোকা?”

“না, পুলিশকে খবর দেব না। কথা দিচ্ছি।”

“তোমার কথায় কোনও বিশ্বাস নেই। বাঙালিরা খুব মিথ্যে কথা বলে।

আমি তো কলকাতায় অনেক দিন ছিলাম। বাঙালিদের চিনি। একা-একা লড়াই করার সাহস নেই। বাঙালিরা কাপুরুষ!”

“একটা ছোট ছেলেকে একেবারে খুন করার জন্য যারা গুলি চালায়, তারা কাপুরুষেরও অধম। তুমি বাঙালিদের এখনও চেনোনি। একজন খোঁড়া লোকের হাতেই তোমার প্রাণ যাবে। তুমি কোনও একটা জায়গা ঠিক করে বলো, আমি সেখানেই যাব। আর কেউ থাকবে না।”

“সেখানেও তুমি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওসব চলবে না। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে হঠাৎ কোনও জায়গায়। আগে থেকে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। সেটাই এই খেলার নিয়ম। সেটা কালও হতে পারে। দু’সপ্তাহ পরেও হতে পারে।” লাইন কেটে দিল কর্নেল।

আজ হাসপাতালে সস্তুর কেবিনে সকলে এসেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, বিপদ কেটে গিয়েছে, আর ভয় নেই। অন্য গুলিটাও বের করা গিয়েছে। দুটি গুলিই লেগেছিল হৃৎপিণ্ডের ঠিক নীচে। আর আধ ইঞ্চি উপরে লাগলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হত।

অর্ধেকটা উঁচু হয়ে বসে একটু একটু করে সুপ খাচ্ছে সন্তু। দারুণ রোগা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। গাল দুটো এমন চোপসানো যে, প্রায় চেনাই যায় না। ডাক্তাররা বলেছেন, সন্তুকে আরও দিনদশেক থাকতে হবে হাসপাতালে, তারপর বাড়িতে গিয়েও অন্তত দু’মাস বিশ্রাম। সন্তুর গলার আওয়াজটাও টি-টি হয়ে গিয়েছে। শুধু জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ।

সন্তুর এক পাশে বসেছেন মা, অন্য পাশে জোজো। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

সন্তু বলল, “আমি কি মরেই যাব ভেবেছিলি নাকি রে জোজো?”

জোজো দু’দিকে জোর মাথা নেড়ে বলল, “না।”

মা বললেন, “আমি রোজ তোর নামে প্রার্থনা করেছি।”

সন্তু বলল, “মরব কেন? কত কাজ বাকি আছে। কাকাবাবু, আমাদের সেই অরুণাচলের গুহায় যেতে হবে না? সেটা কবে?”

কাকাবাবু বললেন, “না রে সন্তু, তোর আর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। দাদা যেতে দেবেন না।”

সন্তুর বাবা বললেন, “মোটাই সেই কথা বলিনি আমি। এখন এই অবস্থায় তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েক মাস পরে চাঙা হয়ে উঠুক, তারপর কি আর ওকে আটকানো যাবে!”

মা বললেন, “আটকাতে হলে রাজাকেই আটকানো উচিত। ওর এত বারবার বিপদের মধ্যে যাওয়ার দরকার কী?”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু রিটার্ড লোকের মতো বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবে, এ কি ভাবা যায়?”

বাবা বললেন, “রাজা ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে, সন্তুও সেরকম হয়েছে।”

ডাক্তার আহমেদ মাত্র পনেরো মিনিট সময় দিয়েছেন। সন্তুর বেশি কথা বলা বারণ। দেখতে দেখতে কেটে গেল সময়, সকলকে বেরিয়ে আসতে হল।

কাকাবাবু জোজোর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, “আজকের মতো আনন্দের দিন আমার জীবনে খুব কম এসেছে।”

জোজো বলল, “আজই আমার জীবনের বেস্ট দিন।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি কতদিন কিছু খাওনি। খুব ইচ্ছে করছে, আজ তোমাকে পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্টুরাঁয় নিয়ে গিয়ে ভাল করে খাওয়াই। কিন্তু সন্তুকে বাদ দিয়ে তো যাওয়া ঠিক নয়। সন্তু একেবারে সেরে উঠুক, ততদিন খাওয়াটা বাকি থাক।”

জোজো বলল, “আজ অবশ্য আমারও যাওয়ার উপায় নেই। অমিতাভ বচ্চন আমার বাবাকে আর আমাকে ‘সোনার বাংলা’ হোটেলে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলেন তো দুপুরবেলা। সচিন তেভুলকর কনুইয়ের ব্যথা সারাবার জন্য আসছেন কাল।”

জোজো আবার তার আগেকার স্বভাবে ফিরে গিয়েছে দেখে নিশ্চিত হলেন কাকাবাবু। তিনি বললেন, “ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও। আমি একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঘুরে যাব।”

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। এখন থেকে ছ’মাস একটা বিপদ যে সব সময় তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে, সে-কথা তিনি এখনও কাউকে বলেননি। ইচ্ছে করে তিনি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। কখন কোথা দিয়ে ছুট করে এসে যাবে কর্নেল ধ্যানচাঁদ, তার ঠিক নেই। আসে তো আসুক। ধ্যানচাঁদ বলেছিল, পিছন থেকে কখনও আক্রমণ করবে না। আসবে সামনে দিয়ে। সেটাই যা ভরসা। আশা

করি, কথা রাখবে। সামনের দিক থেকে কোনও লোকেকে আসতে দেখলেই কাকাবাবু চোখ সরু করে তাকাচ্ছেন। সবসময় শক্ত করে রাখতে হচ্ছে কাঁধ। এ কী জ্বালা! অথচ উপায়ও তো নেই। আজও দেখা গেল না কাউকে।

বাড়িতে এসে কাকাবাবু টেলিফোন করলেন ভোপালে। সেখানকার পুলিশের এক কর্তার নাম সুদর্শন পাণ্ডে, কাকাবাবুর বিশেষ পরিচিত। ঐর বড়ভাই কাজ করতেন কাকাবাবুর সঙ্গে। ভোপালের সব টেলিফোন নম্বর বদলে গিয়েছে। আজই লালবাজার থেকে কাকাবাবু কয়েকটা নতুন নম্বর উদ্ধার করেছেন। সুদর্শন পাণ্ডেকে সহজেই পাওয়া গেল তাঁর অফিসে। এঁরা সন্দের পরেও কাজ করেন।

প্রথমে কুশল সংবাদ আর বাড়ির খবরটবর নেওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, “সুদর্শন, দু’-একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই যো।”

সুদর্শন পাণ্ডে বললেন, “বলুন রাজাদা, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কী সাহায্য করতে পারি?”

কাকাবাবু বললেন, “পাঁচ-ছ’ বছর আগে তোমাদের ওখানে ভীমবেটকায় একটা ডাকাতির কেস হয়েছিল, মনে আছে?”

সুদর্শন বললেন, “হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? বিখ্যাত কেস। আপনার বুদ্ধিতে রাতিরবেলা এক ডজন ক্রিমিনাল ধরা পড়েছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ে, আপনি এমন কায়দা করেছিলেন, কেউ পালাতে পারল না, ভীমবেটকার অমূল্য সব জিনিস বেঁচে গেল।”

কাকাবাবু বললেন, “সে রাতে ঠিক কারা কারা ধরা পড়েছিল, সেই নামগুলো আমায় দিতে পারবে?”

সুদর্শন বললেন, “সেসব নাম তো আমার মনে নেই। আমি কেসটার সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমি তখন পোস্টেড ছিলাম পাঁচমারি শহরে। তবে ফাইল দেখে বলে দিতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, তুমি ফাইল দেখে নামগুলো আমাকে জানাও। আর-একটা কাজ করতে হবে। সুরজকান্ত নামে কেউ সেই সঙ্গে ধরা পড়েছিল কিনা, সেটাও দেখবে।”

সুদর্শন জিঙেস করলেন, “ওই সুরজকান্তের পদবি কী?”

কাকাবাবু বললেন, “তা আমি জানি না। সেটা জানতে হবে। ওর ফ্যামিলি সম্পর্কেও জানতে চাই।”

সুদর্শন বললেন, “রাজাদা, শুধু নাম শুনে একটা লোককে ট্রেস করা খুব শক্ত কাজ।”

কাকাবাবু বললেন, “শক্ত কাজ বলেই তো তোমাকে অনুরোধ করছি।”

সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, “কী করে সেই লোকটি?”

কাকাবাবু বললেন, “সে বেঁচে নেই। পাঁচ-ছ’ বছর আগে মারা গিয়েছে। সেই রাতে সম্ভবত ভীমবেটকায় উপস্থিত ছিল। সে হিষ্টি নিয়ে শখের চর্চা করত। খুব সম্ভবত সুরজকান্ত নামে সে পত্রপত্রিকায় দু’-একটা লেখাও বের করেছিল। তুমি হিষ্টির কোনও পণ্ডিতের কাছে খোঁজ নাও, তিনি হয়তো চিনতে পারবেন।”

সুদর্শন বললেন, “ঠিক আছে রাজাদা, আমাকে কিছুটা সময় দিন।”

এক ঘণ্টার মধ্যেই সুদর্শন ফোন করে বললেন, “রাজাদা, আমি ভীমবেটকার ফাইলটা পেয়েছি। যারা ধরা পড়েছিল, তাদের নামগুলো পড়ে শোনাব?”

কাকাবাবু বললেন, “শোনাও!”

নামগুলো পড়ার পর সুদর্শন বললেন, “এর মধ্যে সুরজকান্ত বলে কারও নাম নেই। অথচ আপনি যে বললেন, সেই রাতে সে ওখানে উপস্থিত ছিল?”

কাকাবাবু বললেন, “এই লিস্টে রামকুমার পাধি বলে একটা নাম আছে। সে কে?”

সুদর্শন বললেন, “ওরে বাবা, সে তো একটা খুব নটোরিয়াস ক্রিমিনাল। অনেক খুন করেছে। একেবারে গলা কেটে ফেলত। ওকে ধরিয়ে দিয়েই তো আপনি একটা সাংঘাতিক কাজ করেছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি ওকে চিনতামই না। অন্যদের সঙ্গে ধরা পড়তে পারে। সেই রামকুমার পাধির শেষ পর্যন্ত কী শাস্তি হল?”

সুদর্শন বললেন, “ফাইলে তো লেখা রয়েছে দেখছি, রামকুমার পাধি জেলের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তবে, ওর যা ক্রিমিনাল রেকর্ড, বিচারে ওর ফাঁসি হতই। সেটা বুঝেই সে আত্মহত্যা করেছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “সুদর্শন, গত মাসের খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে যে, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি শহরে এক সকালে চায়ের দোকানে একজন লোককে তিনজন আততীয় এসে গুলি করে খুন করে যায়। পুলিশ আইডেন্টিফাই করেছে যে, ওই খুন হওয়া লোকটির নাম রামকুমার পাধি।

সে একজন কুখ্যাত ক্রিমিনাল। এখন ভোপালের জেলে যে-রামকুমার পাধি আত্মহত্যা করল, আর ছ'বছর পরে মাণ্ডিতে যে রামকুমার পাধি খুন হল, তারা কি একই লোক, না আলাদা?"

সুদর্শন বললেন, “এই রে, ওটা হিমাচল প্রদেশের ব্যাপার। আমরা কিছুই জানি না। ঠিক আছে, আমি এটারও খোঁজ নিচ্ছি।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আর সুরজকান্ত সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?"

সুদর্শন বললেন, “সে তো আরও সময় লাগবে। এত তাড়াতাড়ি হবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “সুদর্শন, তোমার অনেক সময় নিচ্ছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ওই সুরজকান্তের ফ্যামিলির খবরটা জানা আমার খুব দরকার। হয়তো আমি ভোপালেও একবার আসব শিগগিরই। আর একবার ভীমবেটকা দেখতে যাব।”

সুদর্শন উৎসাহের সঙ্গে বলল, “আসুন আসুন, চলে আসুন। শুধু একটু খবর দেবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।”

সন্তু বাড়ি ফিরে আসার দু'দিন পর কাকাবাবু গেলেন শঙ্করপুর। সেখানে একটা গেস্ট হাউজ বুক করা আছে। সন্তুকে দেখার জন্য যত রাজ্যের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসছে সকাল-বিকেল। বাড়িতে সর্বক্ষণ ভিড়। সকলে একই গল্প শুনে চায় বারবার। ভূতের বাড়িতে কে গুলি করেছিল সন্তুকে?

গল্প বলার দায়িত্ব জোজোর। সে বানাতে বানাতে ঘটনাটা এত দূর নিয়ে গিয়েছে যে, আসল ঘটনাটা আর চেনারই উপায় নেই। তার গল্পে ভূত আর ডাকাত মিলেমিশে যায়।! সন্তুর গুলিতে তিনটে ডাকাত আর দুটো ভূত ঘায়েল হওয়ার পর সন্তুর রিভলভারে গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ও আর গুলি ভরার সময় পায়নি। তার মধ্যেই একজন ওর বুকে আচমকা গুলি চালিয়ে দেয়। গুলি না ফুরোলে সন্তুকে মারার সাধ্য ছিল না কারও। সন্তু বিছানায় আধশোওয়া হয়ে এইসব গল্প শুনে মিটিমিটি হাসে। সে জানে, জোজোর গল্পের প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই।

কাকাবাবু কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে কাটাতে চান সমুদ্রের ধারে। সঙ্গে

কয়েকটা বই এনেছেন। সারাদিন বারান্দায় বসে পড়েন সেই বই। বিকেলবেলা সমুদ্রের ধারে হাঁটতে যান। এদিক-ওদিক নজর রাখেন, কর্নেল আর তার দলের কেউ আছে কি না।

তিন দিনের মধ্যেও তাদের কারও পাত্তা নেই। এই এক ঝামেলা। মারামারি যখন হবেই, তখন চুকে গেলেই তো হয়। দিনের পর-দিন অপেক্ষা করাটাই বিরক্তিকর। ওই কর্নেল লোকটা কোথায় কখন হুস করে উদয় হবে, তারও তো ঠিক নেই।

কোথাও একা থাকতে চাইলেও তো একা থাকা যায় না। গেস্ট হাউজের পাশের ঘরটিতে আছে একটি বাঙালি পরিবার। বাবা, মা একটি বারো বছরের মেয়ে আর সাত বছরের ছেলে। এদের মধ্যে মেয়েটির নাম পূর্বা, সে কাকাবাবুকে চিনে ফেলেছে। নানাসাহেবের সিন্দুক রহস্য ধরে ফেলার পর কাকাবাবুর ছবি ছাপা হয়েছিল অনেক কাগজে। পূর্বা সেই ছবি কেটে রেখেছে। ‘সবুজ দীপের রাজা’ সিনেমাও দেখেছে টিভিতে। সে আর তার বাবা-মা-ও প্রায়ই গল্প করতে আসেন কাকাবাবুর সঙ্গে।

পূর্বার বাবা চাকরি করেন জামশেদপুরে। তিনি দু’-তিনবার বললেন, “কাকাবাবু, আপনি একবার জামশেদপুরে আসুন না, ওখানেও অনেক রহস্যের সন্ধান পাবেন।”

কাকাবাবু হালকাভাবে উত্তর দেন, “আচ্ছা দেখি, যাব কোনও এক সময়।”

পূর্বা হাততালি দিয়ে বলে, “হ্যাঁ, তা হলে খুব ভাল হবে। কাকাবাবু আমাদের বাড়িতে থাকবেন।। সন্তুকেও নিয়ে আসতে হবে কিন্তু।”

পূর্বার বাবা কাকাবাবুরই সমবয়সি হবেন। তিনিও বলছেন, ‘কাকাবাবু’, মেয়েও বলছে ‘কাকাবাবু’! সকলের কাছেই তিনি মার্কামারা ‘কাকাবাবু’ হয়ে গিয়েছেন। আজকাল সাধারণত কেউ কাকাকে কাকাবাবু বলে ডাকে না। বলে কাকু কিংবা আঙ্কল। কিন্তু রায়চৌধুরীদের বাড়িতে কাকাবাবু, জ্যাঠাবাবু, মামাবাবু বলে ডাকাই রীতি ছিল। সেই জন্য সন্তু ‘কাকাবাবু’ বলে, অন্যরাও তাই বলে শুনে শুনে।

একদিন একটা পুলিশের গাড়ি থামল সেখানে।

বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। পুলিশ কেন এখানে? তাঁর কাছে কেউ পাঠিয়েছে? মোবাইল ফোনে কথা হয় বাড়ির

সঙ্গে। সম্ভব ভালই আছে। নিজে নিজে খাট থেকে নামতে পারে, কিন্তু এখনও তার হাঁটা নিষেধ।

কাকাবাবু ধরেই নিলেন, পুলিশ এসেছে তাঁর কাছে।

আসলে তা নয়। একটু পরে পূর্বা এসে জানিয়ে গেল, পুলিশ অফিসারটি তার মাসতুতো জামাইবাবু। তিনি কাঁথি থানার ওসি, এমনিই এসেছেন পূর্বাদের খবর নিতে।

পূর্বা তাঁকে নিয়ে এল কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করাতে। লোকটির নাম রমেন দত্ত। তিনিও কাকাবাবুর নাম শুনেছেন। পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

কাকাবাবু মনে মনে ভাবলেন, এই রে, যদি কর্নেল ধ্যানচাঁদ কিংবা তার দলবল তাঁর উপর নজর রেখে থাকে, তা হলে তারা নিশ্চয়ই মনে করবে, কাকাবাবুই পুলিশ আনিয়েছেন। ভাববে, তিনি ভয় পেয়েছেন। তা হলে আর এখানে থাকা হবে না।

সেদিন বিকেলে সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে কাকাবাবু গেলেন ধীরদের গ্রামের দিকে। এখানে একটা পুরনো কালের মন্দির আছে। ভাঙাচোরা অবস্থা, বিশেষ কেউ আসে না। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে কয়েকটা টেরাকোটার মূর্তি আছে। কাকাবাবু ভাবলেন, মূর্তিগুলো দেখে আসবেন। আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। খুব শিগগিরই বৃষ্টি নামবে। হাওয়া দিচ্ছে শনশন করে। মন্দিরটার পাশ দিয়েই একটা রাস্তা গিয়েছে। কাকাবাবু আগের দিনও এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখানে একবার থেমেছিলেন। কিন্তু কাছে আসেননি। মন্দিরটার সামনেই দু'ধারে লাইন দিয়ে বসে আছে কয়েকজন ভিথিরি। সবাই বেশ বুড়ো। কাকাবাবুকে দেখেই সবাই 'বাবু দাও, কিছু দাও' বলতে লাগল।

কাকাবাবু প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটি বের করলেন। পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকার নোটই বেশি, আর কিছু খুচরো পয়সা। আর কয়েকটা দু'টাকার নোট আছে। আজকাল ভিথিরিরা খুচরো পয়সা নিতে চায় না।

তিনি দু'টাকার নোটগুলো দিতে লাগলেন এক-একজনকে।

একজন বলল, “হায় ভগবান, সর্ফ দো রুপিয়া! এ বাবু, দশঠো রুপিয়া দেও!”

কাকাবাবু বললেন, “না, না, হবে না। সকলকে সমান দিচ্ছি।”

বুড়িটি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরল।

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, “লায়লা! দারুণ মেকআপ নিয়ে বুড়ি সেজেছ, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ঠিক ধরেছি!”

লায়লা হেসে বলল, “সত্যিই, দারুণ চোখ তো তোমার। দেখি দেখি, তাকাও আমার দিকে।”

লায়লার অন্য হাতে মুঠো করা কিছু ছিল, সেগুলো ছুড়ে দিল কাকাবাবুর চোখে। কাকাবাবু ‘উঃ’ করে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য বুড়িগুলোও খলখল করে হেসে উঠে দাঁড়াল। তাদের হাতের শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়তে লাগল।

লায়লা চৈচিয়ে বলল, “সবাই মিলে ওকে ধরো। বয়ে নিয়ে যাব।”

পাঁচ-ছ’ জন মিলে কাকাবাবুকে জাপটে ধরলেও কাকাবাবু কোনওক্রমে ছাড়িয়ে নিলেন নিজেেকে। টলতে টলতে খানিকটা পিছিয়ে এসে চোখ খুললেন, তাঁর চোখ টকটকে লাল।

কাকাবাবু বললেন, “আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অন্ধ লোকরাও লড়াই করতে পারে। কেউ আমার গায়ে হাত ছোঁয়াতে এলেই তার আঙুলগুলো কচুকাটা হবে।”

একটা ক্রাচ পড়ে গিয়েছে, অন্য ক্রাচটা তিনি ছাড়েননি। তার দুটো বোতাম টিপতেই একসঙ্গে বেরিয়ে এল ছ’খানা লম্বা ছুরি।

লায়লা অন্যদের বলল, “সাবধান, কেউ কাছে যাবি না। দু’-একটা পাথর নিয়ে আয় তো। পাথর ছুড়ে মারতে হবে ওর মাথায়।”

কিন্তু বালির জায়গা, পাথর পাবে কোথায়। মন্দিরের ভাঙা ইট খুঁজতে গিয়েই একজন বলে উঠল, “এই, এই, পুলিশের গাড়ি!”

এমনিই মেয়েগুলো সবাই দৌড়ে পালাতে শুরু করল।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল একটা গাড়ি। জানলা দিয়ে মুখ বের করে রমেন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, “কী কাকাবাবু, কিছু হয়েছে?”

কাকাবাবুর দু’চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কোনওক্রমে তা সহ্য করে তিনি বললেন, “না, কিছু হয়নি তো! এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।”

রমেন দত্ত আবার বললেন, “গেস্ট হাউজে ফিরবেন? আমার গাড়িতে উঠুন না, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।”

কাকাবাবু বললেন, “তার দরকার নেই, তুমি এগোও!”

এবারে লায়লারা নির্ঘাত ধরে নেবে, পুলিশ এসে কাকাবাবুকে বাঁচাল।

অথচ এটা কাকতালীয়। এই সময় হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। কাকাবাবু মুখটা তুললেন আকাশের দিকে। বৃষ্টির জলে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

প্লেনটা দেড় ঘণ্টা লেট করে পৌঁছোল। কাকাবাবু ছ'বছর পর এলেন ভোপালে। এয়ারপোর্টটা বেশ বদলে গিয়েছে। অনেক বড় আর আধুনিক হয়েছে। সেবারে সস্তা আর জোজো সঙ্গে এসেছিল। এখানে ছিল ধীরেন, রীনা, আর তাদের দুই ছেলে। খুব আড্ডা আর মজা হয়েছিল। অবশ্য পরে খুনোখুনি আর সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছিল, তবু লোভীদের কাছ থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল ভীমবেটকার মতো ঐতিহাসিক মূল্যবান জায়গা।

ধীরেন আর রীনারা এখানে নেই। সুদর্শন এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু কোনওক্রমেই পুলিশের সাহায্য নিতে চান না। এর মধ্যে সুদর্শনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু তিনি থাকবেন ঠিক করেছেন একটা হোটেলে। সেটা শহর থেকে একটু বাইরে। এই সময় ভোপালে খুব গরম হয়। তবু কাকাবাবু পরে আছেন একটা মোটা জামা, অনেকটা জ্যাকেটের মতো। উপহার পাওয়া।

আসবার সময় তাঁর বউদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, “রাজা, তুমি ওখানে ওই জামাটা পরে যাচ্ছ, তোমার গরম লাগবে না?”

কাকাবাবু বলেছিলেন, “বউদি, কয়েকবার বৃষ্টিতে ভিজে আসায় বেশ ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। তা ছাড়া, প্লেনে যাওয়ার সময় এক-একদিন এমন ঠান্ডা ছাড়ে যে, শীত লেগে যায়।”

সস্তা এখন বেশ ভাল আছে। তার বুকজোড়া বিশাল ব্যান্ডেজ এখনও রয়েছে বটে, কিন্তু সে নিজেই হেঁটে হেঁটে টয়লেটে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়াশোনাও শুরু করেছে। তার পরীক্ষা সামনে। সে এই অবস্থাতেই পরীক্ষা দেবে।

সস্তা জিজ্ঞেস করেছিল, “কাকাবাবু, এখন হঠাৎ ভোপালে যাচ্ছ কেন?”

কাকাবাবু এখনও ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদের ডেথ-ডেথ খেলার কথা সন্তকে বলেননি, কাউকেই বলেননি। সস্তার ওই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “ভীমবেটকার গুহাগুলো আর একবার দেখে আসব ভাবছি। হাতে তো কোনও কাজ নেই এখন!”

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। অন্য কাজও আছে, একবার ভীমবেটকাতেও যাবেন ঠিকই।

নিজের ব্যাগটা সংগ্রহ করে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। এখন দুপুর দুটো। প্লেনে খাবার দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর পছন্দ হয়নি, খাননি। খিদে পেয়েছে, হোটেলের পৌঁছে কিছু খেতে হবে।

ট্যাক্সির লাইন থেকে প্রথম ট্যাক্সিটাই নিলেন কাকাবাবু।

ড্রাইভার একা, তার কোনও সঙ্গী নেই। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে দরজা খুলে তিনি ভিতরে বসলেন।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাবেন স্যার?”

কাকাবাবু বললেন, “অলিম্পিক হোটেল। চেনো তো?”

ড্রাইভার বলল, “নিশ্চয়ই চিনি। খুব বড় হোটেল।”

ট্যাক্সিটা এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে ছুটল হাইওয়ে দিয়ে। পিছনে কোনও গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা, তা দেখতে লাগলেন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কেউ আসছে না বুঝে নিশ্চিত হয়ে ভাল করে হেলান দিয়ে বসতেই চমকে উঠলেন। ড্রাইভারের পাশ থেকে উঠে এল লায়লা। তার হাতে রিভলভার।

সেই রিভলভার একেবারে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে লায়লা বলল, “একদম নড়বে না। তোমার ভাইপোর চেয়ে আমার টিপ অনেক ভাল। মাথাটা ছাতু করে দেব।”

কাকাবাবু বিস্ময় সামলে নিয়ে হালকা গলায় বললেন, “নলটা কপালে ঠেকিয়ে তারপর গুলি করলে তার জন্য আবার টিপ লাগে নাকি?”

লায়লা বলল, “ট্রিগারটা টিপলে তোমার মাথার ঘিলুফিলু চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সেটা কি ভাল হবে?”

কাকাবাবু বললেন, “মোটাই ভাল হবে না, তাতে ট্যাক্সিটা নোংরা হয়ে যাবে। ড্রাইভার সাহেবকে কষ্ট করে ধুতে হবে।”

লায়লা বলল, “সুতরাং চুপ করে বসে থাকো।” তারপর ড্রাইভারকে বলল, “গাড়ি থামাও। ওকে সার্চ করো।”

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে কাকাবাবুর পকেট হাতড়ে রিভলভারটা বের করে নিল।

লায়লা বলল, “ওর ক্রাচ দুটোও সামনে নিয়ে এসো। ও দুটো ডেঞ্জারাস জিনিস।”

ড্রাইভার সে দুটো সরিয়ে নেওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, “এখন তো

আমার কাছে আর অস্ত্র নেই! এবার তোমার রিভলভারটা সরাও। তুমি ছেলেমানুষ, হঠাৎ ট্রিগারে হাত চলে গেলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।”

লায়লা বলল, “সরাব। তার আগে তোমার হাত দুটো বাঁধতে হবে। নইলে তুমি ড্রাইভার বা আমার গলা টিপে ধরতে পারো!”

ড্রাইভার একটা লোহার চেন দিয়ে বেঁধে দিল কাকাবাবুর হাত।

ড্রাইভার বলল, “চোখ দুটোও বাঁধা দরকার। কারণ, আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা ঐর জনার দরকার নেই।”

প্রতি ট্যাক্সিতেই একটা লাল রঙের কাপড় থাকে, সেটা দিয়ে বাঁধা হল কাকাবাবুর চোখ।

কাকাবাবু বললেন, “বিচ্ছিরি গন্ধ! যাই হোক, রিভলভারটা সরিয়েছ তো?”

লায়লা বলল, “হ্যাঁ। তবে তুমি কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করলে আমি কিন্তু ঠিক গুলি চালাব।”

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল।

কাকাবাবু বললেন, “কয়েক দিন আগে তুমি আমার চোখে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে দিয়েছিলে। আজ একেবারে চোখ বেঁধে দেওয়ালে। চোখ বাঁধা থাকলে আমি কোনওরকম চালাকি করতে পারি না। তবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি? উত্তর দেবে?”

লায়লা বলল, “প্রশ্ন শুনি, তারপর ঠিক করব, উত্তর দেব কিনা।”

“তুমি এই ট্যাক্সিটার মধ্যে কোথায় ছিলে? আমি তো ওঠার সময় তোমায় দেখিনি। ড্রাইভারের পাশের সিট খালি ছিল।”

“ভাল করে দ্যাখোনি। আমি ড্রাইভারের পায়ের কাছে শুয়ে ছিলাম। কন্সল গায়ে দিয়ে।”

“তা দেখিনি ঠিকই। আর-একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমি কোন ট্যাক্সিটা নেব, তা তোমরা বুঝলে কী করে? আমি তো অন্য ট্যাক্সিও নিতে পারতাম!”

“তুমি কখন এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে বেরোচ্ছ, তা একজন জানিয়ে দিয়েছে মোবাইল ফোনে। সেই অনুযায়ী এ-ট্যাক্সিটা এগিয়ে আনা হয়েছে। এটা ছাড়াও ওখানে আমাদের সাতখানা ট্যাক্সির সঙ্গে ব্যবস্থা করা ছিল। একটা না-একটায় তো তোমাকে উঠতেই হত।”

“এয়ারপোর্টের মধ্যেও তোমাদের লোক আছে?”

“শুধু কি তাই? কলকাতা থেকেও তো একজন এই প্লেনেই এসেছে তোমার সঙ্গে।”

“ওরে বাবা, অনেক পয়সা খরচ করো তো তোমরা! কিন্তু জানলে কী করে যে, আজই এই প্লেনে আমি ভোপাল আসব?”

“তুমি দশ দিন আগে টিকিট কেটেছ। কোথাকার টিকিট কাটছ, সেটা জানা কি খুব শক্ত?”

কাকাবাবু বললেন, “হুঁ, তোমাদের দারুণ নেটওয়ার্ক। টাকাপয়সাও অনেক। আমার সেসব কিছুই নেই। এবার আমার লাস্ট কোয়েশেন। তোমাদের ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, আমাদের লড়াই হবে সামনাসামনি। কিন্তু এটা কী হচ্ছে? আমার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, চোখ আর হাত বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেলার জন্য। এটাই কি খেলার নিয়ম?”

লায়লা বলল, “হবে, হবে, সামনাসামনি লড়াই হবে। সেই জন্যই তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাতে তুমি পুলিশের সাহায্য নিতে না পারো। শঙ্করপুরে তো তুমি পুলিশের সাহায্য নিয়েই বেঁচে গেলে। শঙ্করপুরে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারিনি বলে আমি কর্নেলের কাছে ধমক খেয়েছি। তাই এবারে আর আমি কোনও চান্স নিইনি।”

কাকাবাবু বললেন, “শঙ্করপুরে আমি পুলিশের সাহায্য নিইনি। গাড়িটা হঠাৎ এসে পড়ল।”

লায়লা ধমক দিয়ে বলল, “ওসব বাজে কথা ছাড়া। এখানেও তুমি পুলিশের সাহায্য নিতে, সে সুযোগই আমরা দিইনি। তোমাকে বলা হয়েছিল, তুমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারো। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট উন্ডেড, তা আমরা কী করতে পারি। কর্নেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।”

কাকাবাবু একটুখানি হেসে বললেন, “আমাকে ধমক দিতে পারে, এমন মেয়েও আছে! ভাল, ভাল, সার্কাসে তুমি কী খেলা দেখাতে?”

লায়লা বলল, “তোমার কোয়েশেন শেষ হয়ে গিয়েছে। নাউ স্টপ!”

কাকাবাবু বললেন, “মাঝে মাঝে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করে। গান গাইলে মন ভাল হয়ে যায়। একটা গাইব?”

“ইংলিশ অর বেঙ্গলি?”

“বেঙ্গলি হলে তো তুমি বুঝবে না। ঠিক আছে, ইংলিশই গাইছি।”

একটুক্ষণ চুপ করে কাকাবাবু একটা গান বানালেন। তারপর নিজস্ব সুরে ধরলেন সেই গান :

“আ গার্ল প্লেজ উইথ আ টাইগার ইন আ সার্কাস
বাট ইটস নট অ্যালাইভ, ইটস আ কা-কাস!”

লায়লা জিঞ্জের করল, “হোয়াট ইজ কা-কাস?”

কাকাবাবু বললেন, “কথাটার বানান হচ্ছে carcass, কিন্তু ‘আর’-টা উচ্চারণ হয় না। কা-কাস মানে, মরা পশু।”

লায়লা ঝুঁকে এসে কাকাবাবুর গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে বলল, “ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে? স্টপ ইট। মরবে তো কিছুক্ষণ পরেই। এখনও গানের শখ!”

কাকাবাবু বললেন, “আর যদি না মরি? তা হলে তোমারও যে একটা থাপ্পড় পাওনা রইল আমার কাছে। যদি না মরি, তা হলে এটা শোধ দেব কী করে? আমি যে মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না।”

লায়লা ভেংচাতে ভেংচাতে বলল, “তুমি আর ছেলে বা মেয়ে, কারও গায়েই হাত তুলতে পারবে না, রাজা রায়চৌধুরী। দিস ইজ দ্য লাস্ট ডে অফ ইয়োর লাইফ।”

গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা অন্য রাস্তায় ঢুকল বোঝা গেল। এ রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো। গাড়িটা লাফাচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ নয়। এক জায়গায় গাড়িটা থেমে গেল।

কেউ একজন দরজা খুলে বলল, “রায়চৌধুরীকে আনতে পেরেছ? গুড। এবার ওর চোখ খুলে দাও।”

গলার আওয়াজ শুনেই কাকাবাবু বুঝলেন, এ সেই ধ্যানচাঁদ অর্থাৎ কর্নেল।

চোখ খোলার পর কাকাবাবু দেখলেন, এসে পড়েছেন একটা জঙ্গলের মধ্যে। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে দু’জন লোক। কর্নেল ধ্যানচাঁদ যথারীতি পরে আছে প্যান্ট-কোর্ট। একটা বড় মাংসের টুকরো থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সে বলল, “ওয়েলকাম, মিস্টার রায়চৌধুরী। আজই আমাদের খেলা শেষ হয়ে যাবে। তার আগে আমরা একটু কিছু খেয়ে নিচ্ছি। সরি, তোমাকেও দেওয়া উচিত। তুমি কিছু খাবে?”

একটুও চম্ফুলজ্জা না দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, খেতে পারি, আমার খিদে পেয়েছে।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “অ্যাঁই, রায়চৌধুরীকেও মটন রোস্ট দাও। লায়লা, তুমিও খেয়ে নিতে পারো।”

কাকাবাবু চেন দিয়ে বাঁধা হাত দুটো তুলে দেখালেন।

ধ্যানচাঁদ বলল, “না, না, হাত-বাঁধা অবস্থায় খাবে কী করে? লায়লা, ওর বাঁধন খুলে দাও। ওর কাছে অস্ট্রটপ্স নেই তো!”

লায়লা কাকাবাবুর বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, “নেই। তবে, ওই ক্রাচ দুটো দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। ডেঞ্জারাস জিনিস।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “হ্যাঁ, শুনেছি, ওগুলো থেকে ছুরিটুরি বেরিয়ে আসে। গুলিও করা যায় নাকি?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, গুলিও করা যায়।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “এ যে দেখছি জেমস বন্ডের অস্ত্রের মতো। ইন্ডিয়ায় তৈরি?”

কাকাবাবু বললেন, “না। সুইডেনো।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “এ দুটো আমার নিজের কালেকশনে রেখে দেব। তোমার তো আর লাগবে না।”

কাকাবাবুকে এক টুকরো মাংস দেওয়া হল। আর-একটা রুটি।

তিনি বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে বললেন, “বাঃ, ভাল মাংস। এবার একটু জল চাই।”

লায়লা এগিয়ে দিল একটা জলের বোতল।

ধ্যানচাঁদ জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি সিগারেট কিংবা চুরুট খাও? তোমার শেষ যা-যা ইচ্ছে আছে, তা মিটিয়ে নিতে পারো।”

কাকাবাবু বললেন, “না, আমি ওসব খাই না। আমার আর কিছু চাই না। আই অ্যাম ফাইন।”

ধ্যানচাঁদও খাওয়া শেষ করে হাতটাত ধুয়ে বলল, “শোনো রাজা রায়চৌধুরী, আমি খেলাটা আজই মিটিয়ে ফেলতে চাই। আমি ছ’মাস সময়ের কথা বলেছিলাম। কিন্তু আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। তা ছাড়া আমার অন্য কাজ আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “আমাকে ধরেবেঁধে নিয়ে এসে এতজন লোক মিলে মারার চেষ্টা করবে, এটাই বুঝি খেলার নিয়ম ছিল?”

ধ্যানচাঁদ বলল, “না, না, এরা সকলেই চলে যাবে। আমি বলে দিচ্ছি। আমি জেন্টলম্যান, কথার খেলাপ করি না। শুধু লায়লা থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে।”

সে ড্রাইভারকে বলল, “তুমি বাকি দু’জনকে নিয়ে ফিরে যাও। এখানে আর আসতে হবে না। আমার গাড়ি একটু দূরে রাখা আছে। আমি তাতেই লায়লাকে নিয়ে ফিরে যাব। এই লোকটার ডেডবডি এখানেই পড়ে থাকবে, হায়না-শেয়ালরা খেয়ে নেবো।”

অন্য লোক দুটিকে তুলে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দিতেই কাকাবাবু চৈঁচিয়ে বললেন, “আমার ব্যাগ? আমার ব্যাগটা রয়ে গিয়েছে ট্যাক্সিতে।”

ট্যাক্সিটা থেমে গেল।

ধ্যানচাঁদ হেসে বলল, “এখনও ব্যাগের মায়া? ও ব্যাগ তো আর তোমার কাজে লাগবে না রায়চৌধুরী। আ ডেডম্যান নিডস নো লাগেজ। ব্যাগটা এখানে পড়ে থাকারও কোনও মানে হয় না। তাতে তোমার পরিচয় জেনে যেতে পারে কেউ। ড্রাইভার, যাওয়ার পথে একটা বড় নদী পড়বে। সেই নদীতে ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে যেয়ো!”

কাকাবাবু দু’কাঁধ ঝাঁকালেন। ধ্যানচাঁদ ধরেই নিয়েছে, সে জিতবে। দেখা যাক!

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর ধ্যানচাঁদ বলল, “রায়চৌধুরী, আমি তোমাকে চয়েস দিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই করতে চাও, না রিভলভার নিয়ে?”

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, “তলোয়ারের লড়াই? আজকাল তো কেউ শেখে না।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “তুমি জানো কিনা, সেটা বলো। আমাদের ফ্যামিলিতে সকলকে শিখতে হয়। বহুকালের ট্র্যাডিশন।”

কাকাবাবু বললেন, “কর্নেল, তুমি আমার সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই করতে চেয়ো না। আমি আগেই বলে দিচ্ছি, তুমি পারবে না। এটা শুধু আমি নিজের সম্পর্কে গর্ব করে বলছি না। অল ইন্ডিয়া ফেনসিং কম্পিটিশনে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দু’বার। এখন আমি খোঁড়া বলে ছোট্টাছুটি করতে পারি না, তাতে অসুবিধে হয়। তবু সারা ভারতে এই লড়াইয়ে আমার সমকক্ষ আছে মাত্র চারজন। তুমি হেরে যাবে!”

কর্নেল অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, “তুমি অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে জিতেছ? আমি ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছি। তুমি পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারবে না আমার সামনে।”

একটা লম্বা ব্যাগ পড়ে আছে একপাশে। সেটার জিপ খুলে দুটো খাপে ঢাকা তলোয়ার বের করল ধ্যানচাঁদ।

একটা কাকাবাবুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, “লায়লার খুব ইচ্ছে, তোমার বুকো আমি তলোয়ার বসিয়ে দিচ্ছি, সেই দৃশ্যটা ও দেখবে!”

লায়লা বলল, “ফেয়ার গেম হবে। তুমি লড়াই করে হেরে গিয়ে মরবো।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার শখ মিটিয়ে কর্নেল তোমাকে খুশি করতে পারবে বলে মনে হয় না।”

কাকাবাবুর কাছে ক্রাচ নেই, তিনি একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানচাঁদ প্রথম আঘাত করতে আসতেই কাকাবাবু সেটা আটকালেন। তারপর ধ্যানচাঁদ লাফিয়ে লাফিয়ে যতবার মারতে এল, কাকাবাবুর হাত চলল বিদ্যুতের মতো। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি।

একবার ধ্যানচাঁদের তলোয়ার খুব জোর ঠেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, “অত লাফিয়ে লাভ নেই কর্নেল! সিনেমায় ওরকম দেখায়। তুমি একটু পরেই হাঁপিয়ে যাবে!”

কর্নেল বলল, “শাট আপ! আমাকে উপদেশ দিচ্ছ কোন সাহসে?”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, তোমাকে উপদেশ দেব না। এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমার দুর্বলতা কোথায়।”

ধ্যানচাঁদ আরও একবার লাফিয়ে উঠতেই কাকাবাবু তার হাতের মুঠোর ধার ঘেঁষে মারলেন প্রচণ্ড শক্তিতে। ধ্যানচাঁদের হাত থেকে তলোয়ারটা খসে পড়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, “তুলে নাও। আবার লড়ো।” লায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এবার বুঝলে তো, কে কার বুকো তলোয়ার বসিয়ে দিতে পারে?”

ধ্যানচাঁদ বলল, “থাক, এ-খেলাটার দরকার নেই। অনেক সময় লাগবে। রিভলভার ভাল। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। পাঁচটার সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।”

ধ্যানচাঁদ নিজের রিভলভার হাতে নিল।

কাকাবাবু বললেন, “আমি কি আমারটা ফেরত পেতে পারি? নাকি আমাকে খালি হাতে লড়তে হবে?”

ধ্যানচাঁদ বলল, “অফ কোর্স তোমারটা ফেরত পাবে। রায়চৌধুরী, তুমি বোধহয় জানো না, আর্মিতে আমার শার্প শুটার হিসেবে বিশেষ নাম ছিল। তিনটে মেডেল পেয়েছি। আমার একটা গুলিও নষ্ট হয় না।”

কাকাবাবু কোনও মন্তব্য করলেন না। নিজের রিভলভারটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, চেষ্টারে গুলি ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর বললেন, “ঠিক আছে, আমি রেডি।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “আমি কুড়ি পা দূরে গিয়ে দাঁড়াব। লায়লা এক-দুই-তিন গুনবে। তারপর আমরা একসঙ্গে গুলি চালাব। ফাইট টু কিল!”

কাকাবাবু বললেন, “হলিউডের ওয়েস্টার্ন সিনেমায় যেমন দেখা যায়? কিন্তু সেসব সিনেমার প্রত্যেকটাতেই যে হিরো, সে জেতে। ভিলেন তো কখনও জেতে না।”

ধ্যানচাঁদ বলল, “আমি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমিই হিরো।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি এসেছি আমার ভাইপো সন্তুকে মারার চেষ্টার শাস্তি দিতে। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কিন্তু সন্তুকে তুমি খুন করতে চেয়েছিলে।”

ধ্যানচাঁদ রুক্ষ গলায় বলল, “ওসব বাজে কথা এখন থাক। লায়লা, স্টার্ট।”

লায়লা গুনতে শুরু করতেই ধ্যানচাঁদ চট করে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। একটা হাত বের করে চালাল গুলি।

কাকাবাবু রিভলভার তুললেনই না।

ধ্যানচাঁদের পরপর দুটো গুলি এসে লাগল কাকাবাবুর বুকে। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। গুলি দুটোই পড়ে গেল মাটিতে।

দারুণ অবাক হয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ধ্যানচাঁদ বলল, “এ কী হল? এ কী হল?”

লায়লা চেষ্টা করে বলল, “এ লোকটা জাদু জানে!”

কাকাবাবু এবার খালি জায়গায় পেয়ে গুলি চালালেন ধ্যানচাঁদের দিকে। গুলি লাগল ডান হাতে। রিভলভারটা ছিটকে গেল।

সে ‘আঃ’ শব্দে আতঁনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু চেষ্টা করে বললেন, “এবার মারব তোমার বুকে। তারপরই খেলা শেষ!”

অমনি লায়লা ছুটে এসে ধ্যানচাঁদকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, “না, না, ওকে মারার আগে আমাকে মারতে হবে! প্লিজ, আমাকে মারো!”

কাকাবাবু ধ্যানচাঁদকে ওভাবে মারতেন না, শুধু আর-একটু আহত করে দিতেন। লায়লাকে মারার তো প্রশ্নই ওঠে না।

লায়লাও বুঝে গিয়েছে যে, কাকাবাবু কোনও মেয়েকে মারবেন না। সে দু’হাত তুলে ওই কথা বলতে বলতে ডান হাতের মুঠো থেকে একটা কিছু ছুড়ে মারল। এবারে আর লঙ্কার গুঁড়ো নয়, একটা গোলমতো জিনিস।

সেটা দেখতে পেয়েই কাকাবাবু মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে দূরে সরে গেলেন যতটা সম্ভব।

বিকট শব্দে ফাটল একটা হ্যান্ড গ্রেনেড। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা।

কাকাবাবু মাটিতে মুখ গুঁজেছিলেন, আবার মুখ তুলতেই দেখলেন, লায়লা আর ধ্যানচাঁদ দৌড়োচ্ছে একটা ঝোপের দিকে। ব্যথায় চিৎকার করছে ধ্যানচাঁদ।

তারপরই পাওয়া গেল একটা গাড়ির শব্দ।

কাকাবাবু তাঁর বুলেটপ্রুফ জামাটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, “পালাল। ওর লেগেছে, কিন্তু কতটা? ডান হাতের পাঞ্জাটাই কি উড়ে গিয়েছে!”

ক্রাচ দুটো কুড়িয়ে নিয়ে কাকাবাবু জঙ্গলটা পেরিয়ে এলেন। কেউ তাঁকে তাড়া করল না। বড় রাস্তায় এসে তাঁকে অপেক্ষা করতে হল খানিকক্ষণ। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ নয়। দু’-তিনটি প্রাইভেট গাড়িকে তিনি হাত দেখালেন, কেউ থামল না। তারপর এল একটা মিলিটারি কনভয়। কাকাবাবু একেবারে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে দু’হাত তুলে রইলেন। সামনের গাড়িটা ব্রেক কষল। একেবারে তাঁর খুব কাছে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, “কেয়া হুয়া?”

কাকাবাবু বললেন, “জঙ্গলের মধ্যে আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে। অনুগ্রহ করে কাছাকাছি কোনও বাস রাস্তা কিংবা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে আমাকে পৌঁছে দেবেন?”

ড্রাইভারের পাশে বসা একজন অফিসার জিজ্ঞেস করল, “হু আর ইউ? এই জঙ্গলে কী করছিলে?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি একজন সায়েন্টিস্ট। এই জঙ্গলে বুনো চা-গাছ পাওয়া যায় কিনা, তার খোঁজ করতে এসেছিলাম।”

অফিসারই জিজ্ঞেস করলেন, “জঙ্গলের মধ্যে চা-গাছ? এই ভোপালে?”

কাকাবাবু বললেন, “ইয়েস। ভারতের অনেক জঙ্গলে বুনো চা-গাছ পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলো খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ।”

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। বছর দু’-এক আগে এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সঙ্গে তিনি চা-গাছের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এতদিন সকলে জানত, চা-গাছ শুধু হয় বাংলা, অসম আর ত্রিপুরায়। সেখানে চাষ করতে হয়। কিন্তু এখন অন্য কোথাও কোথাও জংলি চা-গাছের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

কাকাবাবুর কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে অফিসার তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন চা-গাছের কথা। বস্তার জেলার জঙ্গলে কয়েকটা বুনো চা-গাছ আবিষ্কার করা হয়েছিল। কাকাবাবু শোনালেন সেই কথা।

একটা মোড়ের মাথায় খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কাকাবাবু অফিসার ও ড্রাইভারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লেন সেখানে।

এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলেন হোটেলে। রাতে পুলিশের কর্তা সুদর্শনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল অনেকক্ষণ। কিন্তু কাকাবাবু তাঁকে আজ দুপুরের ঘটনা বিন্দুবিসর্গও জানালেন না। কাকাবাবু সুদর্শনকে যে কয়েকটা বিষয়ে খবরাখবর নিতে বলেছিলেন, তিনি তার কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কিছুদিন আগে মান্ডি শহরে খুন হয়েছে রামকুমার পাধি। আবার সাড়ে পাঁচ বছর আগে এখানকার জেলে রামকুমার পাধি নামে একজন কুখ্যাত খুনি আত্মহত্যা করেছিল। এটা কী করে সম্ভব? কোন জন আসল?”

সুদর্শন বললেন, “আসল রামকুমার পাধিই খুন হয়েছে মান্ডিতে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে জেলের মধ্যে যে আত্মহত্যা করেছিল, সে-ই সুরজকান্ত?”

সুদর্শন বললেন, “হ্যাঁ, তবে তার নাম ছিল সুরজকান্ত ওরফে ছোটেলাল। ছোটেলাল নামেও তাকে অনেকে চিনত। এই ছোটেলালের নামে ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। সে ছিল একটা স্মাগলার দলের চাঁই। দুর্লভ সব মূর্তি, ছবি, পুরনো কালের মুদ্রা পাচার করাতেই সে ছিল এক্সপার্ট। আবার এই ছোটেলালই সুরজকান্ত নামে ইতিহাস বিষয়ে কিছু লেখা ছাপিয়ে ছিল কাগজে। সে নিজেই লিখত, না অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে ছাপাত, তা জানা যায় না।”

“ছোটেলাল আর সুরজকান্ত, এর মধ্যে কোনটা তার আসল নাম?”

“বাড়িতে তার নাম ছিল সুরজকান্ত।”

“তার বাড়ি কোথায় ছিল। জানতে পেরেছ?”

“হ্যাঁ। তাও জানা গিয়েছে। তার বাড়ি ছিল ইন্দোর শহরে।”

“তার বাড়িতে কে কে আছে?”

“মা নেই, বাবা আছেন। এক বোন আর এক বড় ভাই।”

“বড় ভাইয়ের নাম জানো?”

“জানি। জগমোহন। এরা পদবি ব্যবহার করে না। এই জগমোহন ছিল আর্মি অফিসার। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছিল। কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছে।”

“আর্মিতে তার সুনাম কেমন ছিল, তা কি জানা যেতে পারে?”

“তাও আমি খবর নিয়েছি রাজাদা। আর্মিতে জগমোহনের বেশ সুনামই ছিল। লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করত। ভাল অফিসার। তবে খানিকটা রগচটা। আর-একটা কথা, রাজাদা, এই জগমোহন-সুরজকান্তর বাবা বিমলাপ্রসাদের নামে খুনের চার্জ ছিল। ভাল করে প্রমাণ হয়নি বলে মাত্র পাঁচ বছরের জেল খেটেছে। এদের অনেক টাকা। কী করে এত টাকার মালিক হল বিমলাপ্রসাদ, তা ঠিক জানা যায় না।”

“ইন্দোরে ওদের বাড়ির ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর জানো?”

“ঠিকানা জানি। ফোন নম্বর আপনাকে পরে জোগাড় করে দেব। আর কিছু?”

“সুরজকান্ত জেলের মধ্যে আত্মহত্যা করেছিল না তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল?”

“জেলের রেকর্ডে আত্মহত্যা বলেই লেখা আছে। ওরা তো আর অন্য কিছু বলে স্বীকার করবে না। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে। সেই সময় ওই জেলের ইনচার্জ ছিলেন আবিদ খান। তিনি রিটায়ার করে এই শহরেই আছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি হয়তো আসল ঘটনাটা বলতে পারবেন। আন-অফিশিয়ালি।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার পক্ষে ওই আবিদ খানের সঙ্গে দেখা করার একটা অসুবিধে আছে। সুদর্শন, তুমি আর-একটা উপকার করতে পারো? তুমি আবিদ খানকে অনুরোধ করতে পারো, এই হোটেলে আসবার জন্য?”

সুদর্শন বললেন, “সে ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। আবিদ খান বেশ মজলিশি

মানুষ, গান-বাজনার আসরে প্রায়ই দেখা যায়। এখন রিটার্নার করেছেন, হাতে অনেক সময়। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিচ্ছি। রাজাদা, আপনার শরীর ভাল আছে তো?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, শরীর ঠিক আছে। শুধু একটু ঠান্ডা লেগেছে। খুব গরমে অনেক সময় ঠান্ডা লেগে যায়।”

সুদর্শন বললেন, “তা ঠিক। বুকে ঘাম বসে যায়। রাজাদা, আপনি কিন্তু আমাকে এখনও বলেননি যে, আপনি সুরজকান্ত আর তার ফ্যামিলি সম্পর্কে কেন এত ইন্টারেস্টেড?”

কাকাবাবু বললেন, “জানাব। সময় হলেই জানাব।”

আবিদ খান দেখা করতে এলেন দু’দিন পরে সন্কেবেলা। বেশ হস্টপুস্ট মানুষ। মস্ত বড় গৌফ, মাথার চুল সব সাদা। পাজামা আর ঘি রঙের পাঞ্জাবি পরা।

কাকাবাবুকে আদাব জানিয়ে বললেন, “রায়চৌধুরীসাব, আপনার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয়নি বটে, কিন্তু আপনার বুদ্ধিতেই যে ভীমবেটকায় অনেক ক্রিমিনাল ধরা পড়েছিল, তা আমি জানি। আপনি যে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন, তাতেই আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।”

কাকাবাবু তাঁর হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, “খানসাব, আমার পক্ষে হোটেল থেকে বেরোনোর একটু অসুবিধে আছে। আপনি নিজেই যে এসেছেন, তাতে আমি ধন্য হয়েছি।”

আবিদ খান বললেন, “না, না, আমি তো শুনেছি, আপনার তবীয়ত ভাল নেই। আমি আসব না কেন? অনেকদিন জেলখানার মধ্যে ছিলাম। এখন রোজ বাইরে ঘুরে বেড়াই, গান-বাজনা শুনতে যাই। আর কোনও কাজ নেই।”

কাকাবাবু বললেন, “জেলখানার মধ্যে কতরকম ঘটনা ঘটে। আপনার নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটা বই লিখে ফেলুন না!”

আবিদ খান হেসে বললেন, “লেখার ক্ষমতা থাকলে লিখতাম। সকলের কি আর সে ক্ষমতা থাকে? আপনি কী জানতে চান, হুকুম করুন।”

কাকাবাবু বললেন, “ভীমবেটকায় যাদের ধরা হয়েছিল, তাদের একজনের

নাম সুরজকান্ত। কিন্তু পুলিশ-রিপোর্টে তার নাম নেই। তাতে আছে রামকুমার পাখির নাম। তাই না?”

আবিদ খান বললেন, “রামকুমার পাখির নাম ছিল। কিন্তু সে আসলে ধরা পড়েনি। পুলিশ ভুল করে অন্য একজন রামকুমার পাখিকে ধরেছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “সেই অন্যজনই সুরজকান্ত।”

আবিদ খান বললেন, “না তো। পরে জানা গিয়েছে, তার নাম ছিল ছোটেলাল। অন্য আসামিরাই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। সে ছিল একজন স্মাগলার। একটা ডাকাতির কেস ছিল তার নামে।”

কাকাবাবু বললেন, “ছোটেলাল আর সুরজকান্ত, একই লোকের দুই নাম। কিন্তু পুলিশের কেসে তার নাম তো বদলানো হয়নি। রামকুমার পাখিই ছিল।”

আবিদ খান বললেন, “আসল ব্যাপার কী জানেন, যে-পুলিশ অফিসার তাকে আইডেন্টিফাই করেছিল, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওই লোকটাই রামকুমার পাখি। একটা ফোটো এনে দেখিয়েছিল, রামকুমার পাখির সঙ্গে ছোটেলালের চেহারারও কিছুটা মিল আছে। সুতরাং পুলিশের সন্দেহ হয়নি।”

কাকাবাবু বললেন, “ওই সুরজকান্ত কিংবা ছোটেলাল নামে লোকটা কেমন ছিল, আপনার মনে আছে?”

আবিদ খান বললেন, “জি, মনে আছে। বেশি বছর আগের তো কথা নয়। লোকটা এমনিতে চুপচাপ থাকত। তবে খুব বদরাগী আর গোঁয়ার। হঠাৎ হঠাৎ রেগে উঠত। একদিন একজন ওয়ার্ডারের নাকে হঠাৎ ঘুসি মেরে রক্ত বের করে দিয়েছিল। আর-একদিন অন্য একজন আসামির সঙ্গে মারামারি করেছিল। অথচ তাকে দেখলে বোঝা যাবে না। মনে হত, ভাল বংশের ছেলে। অনেক ভাল বাড়ির ছেলে বখাটে হয়ে যায়, এ ছিল সেই ধরনের।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “সুলতান আহমেদ কে ছিল?”

আবিদ খান বললেন, “সুলতান? সে ছিল ডেপুটি জেলর।”

“সে সুরজকান্তকে জেরা করার সময় খুব মারধর করত?”

“না, না। আসামিদের জেরা করার জন্য তো সি আই ডি অফিসে নিয়ে যাওয়া হত। জেলের মধ্যে তো জেরা হয় না। জেলে আসামিরা কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে, তা সামলানোর ভার ছিল সুলতান আহমেদের উপর।”

“সুরজকান্ত কি আত্মহত্যা করেছিল? প্লিজ, সত্যি কথাটা বলবেন?”

“না, আত্মহত্যা করেনি।”

“কিন্তু পুলিশ-রিপোর্টে আত্মহত্যার কথাই আছে।”

“আত্মহত্যার মতোই দেখিয়েছিল। একদিন সকালবেলা দেখা গেল, সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। রিপোর্টেও তাই আছে।”

“অথচ আপনি বলছেন, সে আত্মহত্যা করেনি। তা হলে কেউ তাকে মেরে ফেলেছিল। সুলতান আহমেদ নয়? না হলে, পরে সুলতান আহমেদের জেল হল কেন?”

“রায়চৌধুরীসাব, সুলতান আহমেদের জেল হয়েছে, তার কারণ, সে কয়েদিদের খাবারের বরাদ্দ থেকে রেগুলার টাকা চুরি করত। আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েছি।”

“শুধু টাকা চুরির জন্য দশ বছরের জেল হয়?”

“লোকটা মারকুটেও ছিল। একটু গন্ডগোল দেখলেই কয়েদিদের ধরে ধরে পেটাত। একটা উনিশ বছরের ছেলে তার মার খেয়ে হঠাৎ মারা যায়। সেই অপরাধেই তার লম্বা জেল হয়। কিন্তু সে সুরজকান্তকে মারেনি। এটা আমি ভাল করেই জানি।”

“আপনি ভাল করেই জানেন? তার মানে কি আপনিই সুরজকান্তকে মেরে ফেলেছিলেন?”

একগাল হেসে আবিদ খান বললেন, “আমি যদি মারতাম, তা হলে আজ আপনার সামনে তা স্বীকার করতেও আমার অসুবিধে ছিল না। অত পুরনো ঘটনার জন্য তো এখন আমার শাস্তি হবে না। আমি কখনও মারধর করিনি। জীবনে কোনওদিন কাউকে একটা থাপ্পড়ও মারিনি। ওসব নোংরা কাজ করত আমার নীচের অফিসাররা। সুরজকান্তকে মারে অন্য আসামিরা।”

কাকাবাবুর বললেন, “জেলের মধ্যে অন্য আসামিরা একজনকে মেরে ফেলল! এটা কী করে সম্ভব?”

আবিদ খান বললেন, “আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সব আসামিই তো আলাদা আলাদা খুপরিতে থাকে না। কিছু কিছু আসামিকে বড় একটা হলঘরে রাখা হয়। সেখানে একসঙ্গে দশ-বারোজন থাকে। ভীমবেটকার আসামিরা সকলে এইরকম একটা ঘরে ছিল। আপনি তো জানেনই, ওই দশ জন আসলে এক দলের নয়, আলাদা আলাদা দলের। ওদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হত। একদিন রাতে ওরা দু’-তিনজনে ঘুমের মধ্যে সুরজকান্তের গলা টিপে মেরে ফেলে। তারপর ওরই জামাটা গলায় বেঁধে লোহার গরাদে ঝুলিয়ে দেয়। রাতে গার্ডরা কিছু টের পায়নি, সকালে দেখা গেল ওই অবস্থা।”

“আপনারা বুঝেছিলেন, ওটা আত্মহত্যার কেস নয়?”

“আমাকে সকালবেলাতেই কোয়ার্টার থেকে ডেকে এনেছিল। দেখলেই বোঝা যায়, ওভাবে আত্মহত্যা করা যায় না। গলায় আঙুলের দাগ। কোনও মানুষই নিজের গলা টিপে মারতে পারে না।”

“রিপোর্টে সেকথা লেখেননি কেন?”

“তা হলে অনেক ঝামেলা হত। এনকোয়ারি হত আমাদের নামে। গাফিলতির অভিযোগ উঠত। আসামিদের ঠিক কে কে সুরজকান্তকে মেরেছে, কী জন্য মেরেছে, তা জানার কোনও উপায় ছিল না। কেউ কিছু স্বীকার করেনি। আমরা কিছুই প্রমাণ করতে পারতাম না। তাই আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়াই সহজ ছিল।”

“পুলিশের মারে কোনও কোনও আসামির মরে যাওয়ার মতো ঘটনাও তো ঘটে?”

“কখনও কখনও ঘটে, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সুরজকান্তের মৃত্যু সেভাবে হয়নি। তা আমি হলফ করে বলতে পারি।”

“অর্থাৎ সুরজকান্ত বা হোটেলাল নিজেও ছিল একজন ক্রিমিনাল। অন্য ক্রিমিনালদের মধ্যে দু’-একজন তাকে খুন করেছে। কারা খুন করেছে তা জানা যায়নি। আপনারাও রিপোর্টে তা চেপে গিয়েছেন।”

“ঠিক তাই!”

কাকাবাবু বললেন, “ধন্যবাদ। আমার এটুকুই শুধু জানার দরকার ছিল। আবিদ খানসাহেব, আমি কথা দিচ্ছি, এতদিন পর এসব নিয়ে আমি খবরের কাগজটাগজে কিছু জানাব না। আমি জানতে চেয়েছি ব্যক্তিগত কারণে।”

আবিদ খানসাহেব বললেন, “ক্রিমিনালদের মধ্যে এরকম প্রায়ই ঘটে। দেশের মধ্যে হোক, বাইরে হোক, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দু’-একজন মরে।”

কাকাবাবু বললেন, “অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আসুন, এবার চা খাওয়া যাক। আজ কোথায় গান শুনতে যাচ্ছেন?”

আবিদ খান চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে কর্নেলের লোকেরা। ফেলে দিয়েছে নদীতে। তাতে তাঁর জামাকাপড়, কিছু কাগজপত্র আর বই ছিল। টাকাপয়সা অবশ্য ছিল না। আজকাল ক্রেডিট কার্ডের যুগ। হোটেলের নীচেই অনেক দোকান

আছে। সেখানকার একটা দোকান থেকে কাকাবাবু দু'সেট জামাপ্যান্ট আর একটা স্লিপিং সুট কিনে এনেছেন। কাগজ-কলম কিছুই নেই সঙ্গে। তবে এইরকম বড় হোটেলের ড্রয়ারে কিছু লেখার কাগজ আর সস্তার কলম রাখা থাকে। কাকাবাবু সেই একটা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগলেন।

বিমলাপ্রসাদ খুনের অভিযোগে পাঁচ বছর জেল খেটেছে।

তার দুই ছেলে জগমোহন আর সুরজকান্ত।

জগমোহন আর্মি অফিসার হয়। সেখানে তার সুনাম ছিল। তবে স্বভাবে কিছুটা বদরাগী।

সুরজকান্ত প্রথমে বিশেষ কিছু করত না, শখের ইতিহাসের গবেষক সেজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। পরে বদলোকদের পাল্লায় পড়ে সে স্মাগলার ও ডাকাতদের দলে যোগ দেয়।

ভীমবেটকায় সে গুহার ছবি তোলাও যায়নি সে রাতে। সে অন্য ক্রিমিনালদের মতো গুপ্তধনের লোভেই গিয়েছিল। রামকুমার পাখির নামে ভুল করে ধরা হলেও, সেও একজন ক্রিমিনালই ছিল।

জগমোহন সম্ভবত তার এই ভাইয়ের পরিবর্তনের কথা কিছুই জানত না। সে ভেবেছিল যে, তার ছোট ভাইটি সরল, ভালমানুষ।

সে তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। রক্তের বদলে রক্ত।

তার ভাইকে খুন করেছে জেলের মধ্যে অন্য অপরাধীরা। সেসব ঠিকঠাক না জেনে সে প্রতিশোধ নিতে চায় রাজা রায়চৌধুরীকে খুন করে।

অদ্ভুত না?

যদি বা সে রাজা রায়চৌধুরীকে কোনওক্রমে খুন করতেও পারে, তারপর যে তাকে পুলিশে ধরবে, তার ফাঁসিও হতে পারে, সে কথা সে ভাবছে না?

জঙ্গলের মধ্যে রাজা রায়চৌধুরীর গুলিতে সে নিশ্চিত আহত হয়েছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে পালিয়েছে।

এরপর সে কী করবে?

সামনাসামনি লড়াই করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখন সে তা ভুলে গিয়ে দলবল জুটিয়ে রাজা রায়চৌধুরীর উপর আক্রমণ চালাতে চাইবে? সেটা খুবই সম্ভব। দেখা যাক, কী হয়!

লিখতে লিখতে কাকাবাবুর ঘুম এসে গেল।

পরদিন তিনি ঠিক করলেন, কলকাতায় ফিরে যাবেন। এখানে তিনি যা জানতে

এসেছিলেন, তা জানা হয়ে গিয়েছে। এখন আর এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। কিন্তু কাকাবাবু সবসময় বিপদের ঝুঁকি নিতে ভালবাসেন। অসীম তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছে, নিজের বাড়ির বিছানায় শুয়ে কোনও অসুখে ভুগে তাঁর মৃত্যু হবে না। একদিন না-একদিন তিনি কোনও পাহাড়ে বা জঙ্গলেই মরবেন। সেটাই তিনি চান।

এত দূর এসে আর-একবার ভীমবেটকা দেখে যাবেন না? একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি চলে এলেন সেখানে। বিকেলবেলা। গাড়িটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে ছোট ছোট পাহাড়। এর মধ্যে কোথায় কোথায় যে গুহাগুলো রয়েছে, তা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। অনেকদিন পর এসে কাকাবাবু দেখলেন, ঢোকার জায়গাটার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। সামনে একটা গেট, কিছুটা অংশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাহারাদারও রয়েছে দু'জন। রোজই কিছু লোক দেখতে আসে জায়গাটা। আজও রয়েছে কয়েকটা গাড়ি। কেউ কেউ খাবারদাবার নিয়ে এসে এখানে পিকনিক করে। ছ'টা বেজে গেলেই সকলকে বের করে দেওয়া হবে, সেকথা লেখা আছে একটা বোর্ডে।

কাকাবাবু সোজা চলে এলেন সাধুবাবার আখড়ায়। সবচেয়ে ভাল গুহাটি দখল করে আছেন সাধুবাবা। আগে এখানে কোনও মূর্তিটুর্তি ছিল না। এখন চার হাতওয়ালা একটা পিতলের লম্বা মূর্তি বসানো হয়েছে। সেটা কোন দেবতার মূর্তি, তা ঠিক বোঝা গেল না। সাত-আটজন নারী-পুরুষ ভক্তের সঙ্গে কথা বলছেন সাধুবাবা। শুধু একটা গেরুয়া লুঙ্গি পরা। খালি গা। মুখ-ভরতি দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুলে জটা। বেশ সাধু-সাধুই চেহারা।

কাকাবাবুকে দেখেই তিনি অন্যদের সঙ্গে কথা থামিয়ে বললেন, “আরে, রাজাজি, আপ কব আয়া?”

কাকাবাবু বললেন, “দু’-তিন দিন আগে। আপনি কথাবার্তা সেরে নিন। আমি অপেক্ষা করছি।”

সাধুবাবা বললেন, “বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।”

কাকাবাবু একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন এক পাশে। ছ’বছর আগের সেই রাতে যে দশ জন ধরা পড়েছিল, তাদের মধ্যে একজন সাধুও ছিল। তবে সে সাধু ইনি নন। ইনি তখন তীর্থ করতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে। একজন চেলার উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন এই আখড়া দেখাশোনার। সেই চেলাটিরও গুপ্তধন পাওয়ার লোভ হয়েছিল। সাধু হলেও অনেকের লোভ

যায় না। সেই চেলাটির জেল হয়েছিল মাত্র তিন বছর। ছাড়া পাওয়ার পর সে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

এই সাধুবাবার অবশ্য কোনও দোষ বা লোভের কথা জানা যায় না। সন্ধে হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বিদায় নিল সকলে। এখান থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। পশ্চিম আকাশে অস্ত সূর্যের লাল রেখা। সেদিকে বেশ মেঘ জমেছে। কাকাবাবু ঠিক করেই এসেছেন। আজ আর ফিরবেন না, রাতটা এখানেই কাটাবেন। এই জায়গাতেই কাকাবাবু এক রাতে দশ জন ক্রিমিনালকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল কর্নেলের ভাই সুরজকান্ত। কর্নেল যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, এটাই তো সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। সে-রাতে কাকাবাবু পুলিশকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন। আজ তিনি পুলিশের কোনও সাহায্য চাননি। সুদর্শনও কিছু জানেন না।

অন্য লোকজন সব বিদায় নেওয়ার পর সাধুবাবা জিজ্ঞেস করলেন, “বলিয়ে রায়চৌধুরীসাব, কেয়া খবর?”

কাকাবাবু বললেন, “সাধুজি, আপনি রাতে কী খান?”

সাধুবাবা বললেন, “দো-তিন রোটি, থোড়া ডাল, অউর এক চামচ মধু। দিনের বেলা ফল ছাড়া কিছু খাই না।”

কাকাবাবু বললেন, “মধু?”

সাধুবাবা বললেন, “এক চেলা মধু দিয়েছে। শিষ্যরাই সবকিছু দেয়।”

কাকাবাবু বললেন, “আজ আর দু’খানা রুটি বেশি বানাবেন? আপনার সঙ্গে খাব। রাতে এখানেই থাকব। একটা এক্সট্রা খাটিয়া আছে নিশ্চয়ই।”

সাধুবাবা বললেন, “আপনি আমার মেহমান। আপনি আমার সঙ্গে অন্ন ভাগ করবেন, এতে আমার পুণ্য হবে। কিন্তু রাজাজি, একটা কথা আছে। বাইরের মানুষরা চলে গেলে আমি পূজায় বসি। ধ্যান করি। তিন-চার ঘণ্টা লেগে যায়। তারপর রুটি পাকাই। আপনি কি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমিও বেশি রাতে খাই। আচ্ছা সাধুজি, এখানে কি এখনও রাতে কেউ আসে?”

সাধুবাবা বললেন, “মাঝে মাঝে আসে। আওয়াজ শুনতে পাই। তবে কাউকে দেখতে পাই না।”

কাকাবাবু বললেন, “এখানে তো সারা রাত দু’জন গার্ডের পাহারা দেওয়ার কথা।”

সাধুবাবা বললেন, “কথা তো আছে। কিন্তু কাজ নেই। গার্ড দু’জন একটু রাত হলেই ভেগে যায়। পাহাড়ের নীচের গাঁওয়ে গিয়ে আরামসে শুয়ে থাকে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে কি এখনও গুপ্তধনের লোভে কেউ কেউ আসে? এখানে গুপ্তধন কিছু নেই, আমি জানি। তবু গুপ্তধনের কথা একবার রটে গেলে লোকের মনে সেটা গেঁথে যায়। যাই হোক, যারা আসে, তারা আপনাকে বিরক্ত করে না তো?”

সাধুবাবা বললেন, “নাঃ! শুধু এক রাতে আমি খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, একসময় মনে হল, কেউ আমার খাটিয়াটা ঠেলছে। ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, কী একটা জানোয়ার দৌড়ে পালাল। মনে হল, জংলি শুয়োর।”

কাকাবাবু বললেন, “এখানে শুয়োর আছে নাকি?”

সাধুবাবা বললেন, “আছে। সেই থেকে আমি ধুনি জ্বালিয়ে রেখে তার পাশে শুই। আগুন দেখলে কোনও জানোয়ার কাছে আসে না।”

একটু পরে সাধুজি পুজোয় বসলেন।

কাকাবাবু হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন সামনের খোলা জায়গাটার দিকে। সাধুবাবা ঠিকই বলেছেন, পাহারাদার দু’জনই নেই। তারা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। লোহার গেটটা তালাবন্ধ। তবে সেই গেট টপকে আসা খুবই সহজ। কর্নেল আর লায়লা কি এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে! ওরা কি হোটেলটার উপর নজর রাখেনি? তাঁর ট্যাক্সিটা অনুসরণ করলেই এখানে পৌঁছে যেতে পারে। দিনেরবেলা দেখা জায়গাগুলোই রাতে রহস্যময় মনে হয়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সত্যিই যেন কেউ লুকিয়ে আছে!

কাকাবাবু ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, “এসো, কর্নেল! এসো ধ্যানচাঁদ ওরফে জগমোহন, আমাদের মারতে চাও তো এসো, লড়ে যাও! রাজা রায়চৌধুরীকে এ পর্যন্ত অনেকেই মারতে চেয়েছে, তুমি পারো কিনা দেখি! তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে যদি হেরে যাই, তবে মরব। তার জন্য আমি রেডি। আর আমাদের যদি মারতে না পারো, তা হলেও তোমাকে আমি ছাড়ব না। সম্ভব হলে তুমি প্রায় মেরে ফেলেছিলে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে!”

কোথাও একটু খসখস শব্দ হলেই কাকাবাবু চট করে সেদিকে ফিরে তাকাছিলেন।

আজ বোধহয় পূর্ণিমা, এর মধ্যেই আস্ত একখানা চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে আকাশে। গরম কমে গিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে

ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা তারা। কী সুন্দর এই সময়টা। চতুর্দিক একেবারে শান্ত।

পিছন দিকে একটা খসখস শব্দ হলেও কাকাবাবু আর ফিরলেন না সেদিকে। না, তিনি আর মৃত্যুর কথা ভাববেন না। এমন শান্ত, সুন্দর জায়গায় খুনোখুনি কিংবা মৃত্যুর কথা চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে আনন্দের। মানুষ কেন নিজে বেঁচে থেকে অন্যদেরও বাঁচতে দেয় না!

ইতালি থেকে একটা চিঠি এসেছে কাকাবাবুর নামে। তাঁর বন্ধু রুডল্ফ আন্তোনিও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আল্পস পাহাড়ে একটা অভিযানে যাওয়ার জন্য। ইতালি, ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডের মাঝখানে এই আল্পস পাহাড়। ইউরোপে সবচেয়ে বড়, উপরে বরফ ঢাকা। আগে ফরাসি দেশ থেকে ইতালি যেতে হলে এই পাহাড় পেরিয়ে যেতে হত। অনেক উঁচু পর্যন্ত ঘোরানো ঘোরানো সেই রাস্তা এখনও আছে। এখন আল্পসের পেটের ভিতর দিয়ে একটা টানেল তৈরি হয়েছে। খুব সম্ভবত সাড়ে ষোলো কিলোমিটার লম্বা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টানেল। গাড়িটাড়ি সেই টানেলের মধ্যে দিয়ে এদেশ-ওদেশ চলে যেতে পারে অনেক কম সময়ে। অত বড় টানেলের মধ্যে যদি কোনও গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, তাতে খুব বিপদ। অন্য গাড়িও পার হতে পারে না। দারুণ ট্রাফিক জ্যাম, সে এক কেলেক্সারি অবস্থা।

কিছুদিন আগে, আল্পসের সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা গাড়িতে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্য কয়েকটা গাড়িতে, অনেক লোকের মৃত্যু হয়। সব কিছু পরিস্কার করতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। তারপরেও বিপদ কাটেনি। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার স্মৃতিতে এখন সব গাড়িই ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে যায়। তারই মধ্যে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খুব জোর আওয়াজ শোনা যায়। কোনও গাড়িটাড়ি কিংবা যন্ত্রপাতির আওয়াজ নয়, অন্যরকম। সেই আওয়াজ শুনলেই বুক কঁপে ওঠে।

সেটা কীসের আওয়াজ কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় গ্রামবাসীদের ধারণা, ওটা পাহাড়ের কান্না। মানুষ অত বড় একটা পাহাড়ের পেট ফুটো করে দিয়েছে, পাহাড় তা সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু পাহাড়ের কি প্রাণ আছে

যে, সে কঁাদবে? সেই আওয়াজটা শুধু সন্ধ্যাবেলাতেই হয় কেন? অনেক ভাবে অনুসন্ধান চালিয়েও সেই শব্দের কারণ বোঝা যায়নি। শব্দটাও থামছে না। অনেক গাড়ির চালক এখন আর ভয়ের চোটে সেই টানেল দিয়ে যায় না। তারা যাচ্ছে সেই উপরের রাস্তা দিয়ে। তাতে সময় বেশি লাগছে, খরচও বেশি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা ওই টানেল কি শেষ পর্যন্ত এমনি-এমনি পড়ে থাকবে?

রুডল্ফ আন্তোনিও লিখেছেন যে, তিনি এগারো জনের একটি দল নিয়ে আল্গস পাহাড়ে যাচ্ছেন সামনের মাসে। দরকার হলে অন্তত এক মাস থাকবেন সেখানে। পাহাড়ের কান্না-রহস্যের সমাধান না করে ফিরবেন না। তাঁর খুব ইচ্ছে, রাজা রায়চৌধুরী এই দলে যোগ দিন। রাজা রায়চৌধুরী হিমালয়ের দেশের মানুষ। হিমালয়ের তুলনায় আল্গস তো বাচ্চা ছেলে। রুডল্ফ জানেন যে, রাজা রায়চৌধুরী হিমালয়ে অনেক ঘুরেছেন। সুতরাং তিনি পাহাড়ের রহস্য ভাল বুঝবেন।

চিঠিটা পেয়ে কাকাবাবু খুব খুশি হলেন। রুডল্ফের সঙ্গে তিনি একবার একটি অভিযানে গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায়। মানুষটি খুবই মজাদার, সবসময় হাসি-ঠাট্টা করতে ভালবাসেন। ওঁর সঙ্গে খুব চমৎকার সময় কাটে। পাহাড়ের কান্নার রহস্যটা জানারও খুব ইচ্ছে কাকাবাবুর।

চিঠি লেখার বদলে এখন ই-মেলেই চট করে উত্তর দেওয়া যায়। সম্মতি জানিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য কাকাবাবু কম্পিউটার খুলে বসার পর তাঁর একটা খটকা লাগল। তিনি এখন ইতালি চলে গেলে কর্নেলের চ্যালেঞ্জের কী হবে? সে নির্ঘাত ভাববে যে, কাকাবাবু দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ভয়ে! নাঃ, আগে ওটার একটা হেস্টনেস্ত করতেই হবে।

সন্ত এখন পুরোপুরি সুস্থই হয়ে উঠেছে বলা যায়। সে কলেজেও যেতে শুরু করেছে। শিগগিরই তার পরীক্ষা। কিন্তু হাঁটার বদলে দৌড়োবার চেষ্টা করলেই সন্তর বুকে একটা তীব্র ব্যথা হয়। সে বুকে হাত চেপে বসে পড়ে। এই ব্যথাটা থাকে প্রায় কুড়ি মিনিট। কোনও ওষুধেই এই ব্যথা সারছে না। এ জন্য কাকাবাবু খুবই চিন্তিত। রিভলভারের গুলির ক্ষত শুকিয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষত কিন্তু রয়েই গিয়েছে। ডাক্তাররাও সেটার কারণ ধরতে পারছেন না। তা হলে কি সন্তকে এই ব্যথা নিয়েই কাটাতে হবে সারাজীবন? সে আর দৌড়োতে পারবে না। বয়স বাড়লে তো ব্যথাটা আরও বাড়তে পারে।

এ-কথা ভাবলেই কাকাবাবুর সারা শরীর জ্বলে ওঠে রাগে। তখনই আবার প্রতিজ্ঞা করেন, ওই কর্নেলকে শাস্তি দিতেই হবে। জীবনে কখনও তিনি মানুষ খুন করেননি। কিন্তু ওই কর্নেলটাকে মারতে তাঁর হাত কাঁপবে না। ভোপালের সেই জঙ্গলেই তিনি কর্নেলকে মেরে ফেলতে পারতেন। একটুখানি দ্বিধা করেছিলেন। তাই লায়লা নামের মেয়েটা বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে গেল কর্নেলকে নিয়ে।

সস্তুর এই অবস্থা দেখে তিনি ঠিক করেছেন, আর দ্বিধা করবেন না। হয় তিনি নিজে মরবেন, অথবা কর্নেলকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে। অনেক দিন অবশ্য ওদের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। কর্নেলের হাতে গুলি লেগেছিল, কিন্তু সেটা কতটা সিরিয়াস? হাতের পাঞ্জায় গুলি লাগলে তো মানুষ মরে না। সেরে উঠতেও বেশি দিন লাগার কথা নয়।

সে কি তবে লুকিয়ে আছে? ভীমবেটকায় কাকাবাবু সারারাত কাটালেন, তখনও সে এল না। ওই জায়গাতেই ওর ভাইকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটাই ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার শ্রেষ্ঠ জায়গা। পুলিশটুলিশ কেউ ছিল না, তাও সে এল না কেন?

কাকাবাবুই ঠিক করেছিলেন যে, কর্নেল যদি কোথাও লুকোবার চেষ্টা করে, তা হলে তিনি ঠিক তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবেন। কিন্তু তার আগে ইতালি আর আল্গস পাহাড় ঘুরে এলে হয় না? এমন লোভনীয় প্রস্তাব!

রুডল্ফকে সেদিনই কিছু উত্তর না দিয়ে দু’-তিন দিন চিন্তা করার সময় নিলেন। ঠিক দু’দিন পরে মাঝরাতে এল কর্নেলের টেলিফোন।

গম্ভীর গলায় সে বলল, “রায়চৌধুরী, আমাদের খেলার কথা ভুলে যাওনি তো?”

কাকাবাবু বললেন, “না, ভুলব কেন? তোমারই তো পাস্তা নেই। এখন কি হাফ টাইম চলছে নাকি?”

কর্নেল বলল, “না, না, সেসব কিছু নয়। তুমি তৈরি থাকো। আবার শিগগির দেখা হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “কোথায় দেখা হবে, বলো! আমি নিজেই সেখানে যাব।”

কর্নেল বলল, “আমি জায়গার নাম বলব, আর অমনি তুমি পুলিশকে সেটা জানিয়ে দেবে! ওসব হবে না। তুমি অপেক্ষা করো, হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। হঠাৎ মুখোমুখি আসাটাই এ-খেলার মজা।”

কাকাবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, “আমি দিনের পর-দিন তোমার অপেক্ষায় বসে থাকব? আমার অন্য কাজ নেই?”

কর্নেল হাসতে হাসতে বলল, “অত রেগে যাচ্ছ কেন, রায়চৌধুরী? রাগলেই দুর্বল হয়ে যাবে। খেলায় পুরো মনোযোগ দিতে পারবে না। তোমার অন্য কাজ থাকে তো করো না। তাতে তো কেউ বাধা দিচ্ছে না। তোমার যেখানে খুশি যেতে পারো।”

কাকাবাবু বললেন, “যদি দেশের বাইরে চলে যাই?”

কর্নেল বলল, “আর ক’দিন পরেই তো পৃথিবীর বাইরে চলে যাবে!”

এর পরেই লাইন কেটে দিল কর্নেল।

কাকাবাবু কিছুক্ষণ বিছানার উপর চুপ করে বসে রইলেন। মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আর সহজে ঘুম আসবে না। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তিনি উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন।

পরদিনই তিনি রুডল্ফকে জানিয়ে দিলেন যে, এখন তাঁর পক্ষে আল্লস পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দুঃখিত। কাকাবাবু ঠিক করলেন, তিনি চুপচাপ বসে থাকবেন না। নিজের কাজ করে যাবেন।

আপাতত তাঁর কাজ একটা বই পড়ে তার ভূমিকা লেখা। তাঁর খুব চেনা একজন ইতিহাসের পণ্ডিত সোমনাথ মন্দিরের উপর একটা বই লিখেছেন, এখনও ছাপা হয়নি। এক হাজার বছর আগে গজনির সুলতান মামুদ এই বিখ্যাত মন্দির আক্রমণ করে লুটপাট করেন। কাকাবাবু নিজে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরির সময় ওই ভাঙা মন্দিরের কাছে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন, অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কলকাতায় বসে এরকম কাজ করা যায় না। অনবরত মানুষজন দেখা করতে আসে। কোনও নিরিবিলি জায়গায় থাকলে ভাল হয়।

তিন দিন পরেই কাকাবাবু ট্রেনে চেপে চলে এলেন ময়ূরভঞ্জ। সেখান থেকে একটা গাড়িতে চেপে ধুলাগড়, দু’ঘণ্টার মধ্যেই।

পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটায় রয়েছে একটা মস্ত বড় জমিদারবাড়ি। এখনকার দিনে জমিদার বলে কিছু নেই। এইসব বাড়ির মালিকরাও গরিব হয়ে গিয়েছে। তাই বাড়িগুলোও ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ধুলাগড়ের এই বাড়িটা শিমুলতলার সেই ভূতের বাড়িটার চেয়েও বড়, অনেকটা অংশই অটুট আছে। বাড়িতে কিছু লোকজন থাকে, আলো

জ্বলে। তাই এটাকে কেউ ভুতের বাড়ি বলে না।

এই বাড়িটার বর্তমান মালিকরা চার ভাই। তাঁদের দু'ভাই-ই থাকেন ভুবনেশ্বরে, একজন বিলেতে। শুধু একজনই রয়ে গিয়েছেন ধুলাগড়ে। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। গ্রামের মানুষদের বিনা পয়সায় ওষুধ দেন। এই মহেন্দ্র ভঞ্জদেও কাকাবাবুর খুব ভক্ত।

কাকাবাবু আগে দু'বার এখানে এসে থেকেছেন। মহেন্দ্র ভঞ্জদেও তো কাকাবাবুকে দেখে খুব খুশি। তিনি পণ্ডিত মানুষ। ওড়িয়া ভাষা, বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি এরকম অনেক ভাষা জানেন। ইচ্ছে করলে তিনি অন্য ভাইদের মতো বিদেশে কিংবা কোনও বড় শহরে গিয়ে অনেক টাকাপয়সা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু দু'-একবার বাইরে গিয়েও টিকতে পারেননি। এই পাহাড় আর জঙ্গল তাঁকে টানে। গ্রামের গরিব মানুষদের সেবা করার জন্যই তিনি হোমিওপ্যাথি শিখেছেন। গ্রামের লোক তাঁর পুরো নাম জানেও না বোধহয়! সবাই বলে 'মহা-ডাক্তার'।

তিনি কাকাবাবুকে বললেন, “কী ব্যাপার রাজাবাবু, এবার আপনি একা এলেন? আপনার মন্ত্রী আর সেনাপতি কই?”

কাকাবাবুদের বংশের কেউ কোনওদিন রাজা কিংবা জমিদার ছিলেন না। তবু তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'রাজা'। কেউ রাজাবাবু বলে ডাকলে অনেক সাধারণ লোক ভাবে, সত্যিই বুঝি তিনি রাজা ছিলেন। মহেন্দ্রকে বারণ করলেও শোনে না। তিনি রাজাবাবু বলে ডাকবেনই।

কাকাবাবু বললেন, “সস্ত্র আর জোজোর পরীক্ষা সামনেই। তাই ওদের আনি। আমি যদি বেশিদিন থাকি, তখন ওরা বেড়াতে আসবে।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “থাকুন না, এখানে দু'-তিন মাস থাকুন। স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যায়। এখানকার জল এত ভাল যে, পাথরও হজম হয়ে যায়।”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমি তো পাথর খাই না। ডাল-ভাত খাই। তা এমনিতেই হজম হয়ে যায়।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “শুধু ডাল-ভাত খাবেন কেন? আপনাকে হরিণের মাংসও খাওয়াবা?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি হরিণের মাংসও খাই না। হরিণের মতো একটা সুন্দর প্রাণীকে মারা আমি একেবারেই পছন্দ করি না।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “রাজাবাবু, আপনি শুধু মাছ খেতে ভালবাসেন, তা জানি। এখানে বড় বড় মাছও পাওয়া যায়। আচ্ছা রাজাবাবু, মাছও তো

দেখতে বেশ সুন্দর। কিন্তু তাদের আমরা মেরে খাই।”

কাকাবাবু বললেন, “তা ঠিক। কিন্তু কিছু তো খেতে হবে। মাছের স্মৃতিশক্তি খুব কম। ওদের মারার সময় তেমন একটা ব্যথাটাখাও পায় না। আমরা যে মাছের ফল ছিঁড়ে খাই, পুরো মাছ কেটে কেটে চাল-ডাল হয়, মাছও তো জীবন্ত প্রাণী, তাই না? মাছের চেয়েও মাছের বোধহয় বেশি ব্যথা লাগে।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “সেকথা ভাবলে তো কিছুই খাওয়া যায় না। ঠিক আছে, আপনাকে আমি একদিন খিচুড়ি খাওয়াব। আমি নিজে রান্না করি। ওরকম খিচুড়ি বাঙালিরা রান্না করতে জানে না।”

মহা-ডাক্তারের একটা পুরনো অ্যান্ড্রাসাডের গাড়ি আছে। সে গাড়ির ড্রাইভারের নাম রাবণ। একালে কারও এরকম নাম শোনাই যায় না। রাবণের বাঁ হাতের তিনটে আঙুল নেই, তবু সে দিব্যি গাড়ি চালাতে পারে। একবার তাকে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঘ আক্রমণ করেছিল, সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সে বেঁচে যায় কোনওক্রমে। শুধু ওই তিনটে আঙুল খোয়া যায়।

ওই গাড়িতে চেপে মহা-ডাক্তার গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করতে যান। কাকাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন একদিন। গ্রামের মানুষ মহা-ডাক্তারকে খুব ভক্তি করে। তিনি ওষুধ দিয়েও কোনও পয়সা নেন না। তবু তারা জোর করে লাউ, কুমড়া, কাঁচাকলা কিংবা মাছ তুলে দেয় গাড়িতে। চিকিৎসা করা ছাড়া অন্য সময় তিনি নিজের হাতে রান্না করেন নানারকম। আর বই পড়েন। কথা বলার সঙ্গী বিশেষ কেউ নেই। কাকাবাবুকে পেয়ে সর্বক্ষণই গল্প করতে চান।

দিনতিনেক থাকার পরই কাকাবাবু বুঝলেন, এখানে থাকলে তাঁর নিজের কাজ হবে না। মহা-ডাক্তার ছাড়াও গ্রামের কিছু কিছু বয়স্ক লোক হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে কথা বলতে। এ-বাড়িতে মাটির তলায় দু’খানা ঘর আছে। লোহার গেট লাগানো। বোধহয় এককালের জমিদাররা ওসব ঘরে দুষ্ট প্রজাদের বন্দি করে রাখত। বাইরের লোককে এড়িয়ে নিরিবিলিতে থাকার জন্য কাকাবাবু একদিন মাটির তলায় একটা ঘরে কিছুক্ষণ কাটালেন। ভেবেছিলেন, ওখানে বসেই লেখাপড়া করবেন। কিন্তু সে-ঘরে অসহ্য গরম। বাইরের কোনও হাওয়া আসে না। আগেকার দিনের লোকেরা এসব ঘরে থাকত কী করে?

কাকাবাবু কয়েকদিন পর মহা-ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, “মহেন্দ্র,

তোমাদের একটা আউট হাউজ ছিল না মোষমুণ্ডি পাহাড়ের উপরে? আমি একবার দেখেছিলাম।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “হ্যাঁ, আছে এখনও। সেটা বিক্রি করার খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু খদের পাচ্ছি না।”

কাকাবাবু বললেন, “সেখানে গিয়ে আমি কয়েকটা দিন থাকতে পারি না? বেশ নিরিবিলিতে লেখাপড়া করব?”

মহা-ডাক্তার বললেন, “না, না, ওখানে থাকবেন কী করে? কাছাকাছি জন-মনিষ্য নেই। কিছু নেই। আগেকার দিনে বাপ-দাদারা যখন জঙ্গলে শিকার করতে যেতেন, তখন ওই বাড়িটা বানানো হয়েছিল। তাঁরা সঙ্গে অনেক দলবল নিয়ে যেতেন। রান্নার লোক, জল তোলার লোক, পাহারাদার সবই থাকত। এখন আর শিকারে যাওয়া হয় না, ওখানেও কেউ থাকে না। সেই জন্যই তো বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছি।”

কাকাবাবু বললেন, “ধরো, আমি যদি বাড়িটা কিনতে চাই, তা হলে একবার দেখে আসতে হবে তো!”

মহা-ডাক্তার বললেন, “আপনি কিনতে চাইলেও আপনাকে বিক্রি করব না। কারণ, আমি জানি, আপনি ওখানে থাকতে পারবেন না। কেউ যদি কারখানা টারখানা বানাতে চায়, তার পক্ষে সুবিধেজনক। এখনও ওখানে কিছু কিছু হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে। একা থাকা ওখানে অসম্ভব।”

কাকাবাবু বললেন, “জানো তো, নেপোলিয়ন বলতেন, অসম্ভব বলে কোনও কিছুই তাঁর ডিকশনারিতে নেই। ইচ্ছে করলে সব কিছুই সম্ভব। তুমি শুধু আমার সঙ্গে একজন লোক দাও, যে রান্নাবান্না করে দেবে। তাতেই আমি ঠিক থেকে যেতে পারব।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “ঠিক আছে, চলুন, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। রান্নার লোক, কাজের লোকও যাবে। কয়েকটা দিন হইহই করে কাটিয়ে আসা যাবে। হরিণ না হোক, দু’-একটা বুনো শূয়ার শিকারও করে ফেলতে পারি।”

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, এই রে, দলবল মিলে গেলে তো তাঁর নিজের কাজ কিছুই হবে না। সারাক্ষণ হইচই করে কাটবে। তিনি মুখে বললেন, “না, না, মহেন্দ্র, তোমাকে যেতে হবে না। তোমাকে অনেক রোগী দেখতে হয়, সে বেচারারা অসুবিধেয় পড়ে যাবে।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “হ্যাঁ, রোজ রোগী দেখতে হয়। কিন্তু রাজাবাবু,

ডাক্তারদের কি ছুটির দরকার নেই? পৃথিবীতে আর সকলেই ছুটি পায়, শুধু ডাক্তাররাই ছুটি পাবে না! সারা বছর ধরে রোজ রোগী দেখতে হবে?”

কাকাবাবু বললেন, “তাও তো বটে। ডাক্তারদের ছুটি অবশ্যই দরকার। তা হলে এক কাজ করা যাক। প্রথমে আমি একাই যাই, আমার কাজ শেষ করি। তারপর তোমাকে খবর দেব। তখন তুমি চলে এলে কয়েকটা দিন একসঙ্গে কাটানো যাবে। এর মধ্যে তুমি রোগীদের তোমার ছুটির কথা জানিয়ে দাও।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “খবর দেবেন কী করে? ওখানে কি টেলিফোন আছে? ইলেকট্রিসিটিও নেই। বাসটাস চলে না, সেরকম রাস্তাও নেই। আগেকার দিনে বাড়ির কর্তারা ঘোড়ায় চেপে যেতেন। আপনাকেও ঘোড়া নিয়েই যেতে হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “তাই যাব। এই খোঁড়া পা নিয়েও আমার ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হয় না। আর খবর দেওয়ার ব্যাপারে, এটা তো মোবাইল ফোনের যুগ। সেই ফোন একটা সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার কাজ শেষ হলেই ফোন করব তোমাকে।”

কাকাবাবুর জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন মহা-ডাক্তার।

পরদিনই ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলেন কাকাবাবু। সঙ্গে আর একটি ঘোড়ায় পিছন পিছন চলল যদু, তার সঙ্গে চাল-ডাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র। সে রান্নাবান্না আর কাকাবাবুর দেখাশোনা করবে। পাহাড়ি উঁচু-নিচু আর এবড়োখেবড়ো রাস্তা। জোরে ঘোড়া ছোটানো যায় না। প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল। দূর থেকে, টিলার উপরে বাড়িটাকে দেখায় একটা ভাঙা দুর্গের মতো। পাশাপাশি দুটো গম্বুজ। ঘোড়া থামিয়ে সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাকাবাবু আপন মনে হেসে উঠলেন। নিজেকে তাঁর মনে হল, এক বিখ্যাত গল্পের বইয়ের চরিত্রের মতো। তিনি যেন ডন কুইকস্জোট (অন্য উচ্চারণে ডনকুহাটি) আর যদু হচ্ছে সান্সো পাঞ্জা। একটা ভাঙা বাড়িকে দুর্গ ভেবে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। হাতে একটা বর্শা থাকলেই মানিয়ে যেত!

তিনি যদুকে জিজ্ঞেস করলেন, “যদু, এ-বাড়ির যা অবস্থা দেখছি, এখানে থাকা যাবে তো? খুব অসুবিধে হবে?”

যদু বলল, “না, আইজ্ঞা। থাকা যাবে। শুধু একটাই অসুবিধা। পানির বড় অভাব। বাড়ির মধ্যে পানি নাই।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে পানি কোথায় পাওয়া যাবে?”

যদু বলল, “তিলং ঝরনা আছে। সেখান থেকে সব পানি আনতে হয় আইজ্ঞা।”

কাকাবাবু বললেন, “রান্নার জল আর খাবার জলটুকু শুধু নিয়ে এসো। এখনও তো মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বৃষ্টির জলে স্নান সেরে নেব।”

গেটের কাছে যেতেই শোনা গেল ফোঁস ফোঁস শব্দ। একটা নয়, তিন-তিনটে কালো রঙের সাপ। যদু অবশ্য সাপ দেখে ঘাবড়াল না। পা দিয়ে ধপাধপ করে আওয়াজ করতেই সাপ তিনটে সরসরিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, “এই সাপেরা বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল নাকি? যাই হোক, আমাদের তো রাস্তা ছেড়ে দিল দেখছি। দোতলার কোনও ঘরে থাকা যাবে?”

যদু বলল, “যাবে আইজ্ঞা। দুইখান ঘর ভাল আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে চিন্তা নেই। সাপেরা দোতলায় ওঠে না। নীচে নামার সময় একটু সাবধানে নামলেই হবে। সাপের গায়ে পা না পড়লে তো কামড়ায় না।”

যদু দু’দিকে মাথা নেড়ে বলল, “না, না, কোনও ভয় নাই।”

গেটের বাইরে এবং ভিতরেও ঝোপ-জঙ্গল হয়ে আছে। বেশ কয়েকটা ধেড়ে ধেড়ে হুঁদুর এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাল। উপরে ওঠার সিঁড়িটার একপাশও বিপজ্জনক ভাবে ভাঙা। অনেক দিন এ-বাড়িতে কেউ থাকেনি, বোঝা যায়। মহেন্দ্র কেন আপত্তি করছিলেন, তাও বোঝা গেল। তবু, দোতলায় এসে কাকাবাবুর বেশ পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটা। ঘরের জানলাগুলো যদিও ভাঙা, কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঢেউ খেলানো পাহাড়, বড় বড় গাছ, আর অনেকখানি আকাশ।

কাকাবাবু সঙ্গে অনেক বইপত্র এনেছেন। সারাদিন এখানে লেখা ও পড়ার জন্য সময়ের কোনও অভাব হবে না। তবে রাতে অসুবিধে হবে। হারিকেন আনা হয়েছে, তাতে পড়াশোনা করা যায় না। তবে, ব্যাটারিচালিত টু-ইন ওয়ান আনা হয়েছে, তাতে রেডিয়ো শোনা যাবে, গানও শোনা যাবে।

প্রথম রাতটা ভালই কেটে গেল।

পরদিন সকালে কাকাবাবু বেরিয়ে পড়লেন আশপাশের জায়গা ঘুরে দেখতে। ঘোড়া নিয়ে আসায় সুবিধে হয়েছে, পাহাড়ের উপর কাকাবাবুকে

হাঁটতে হবে না। ক্রাচ দুটো রেখে যাবেন ভেবেও সঙ্গে নিলেন। কখন কী কাজে লাগবে, তার ঠিক নেই।

গরম কমে এসেছে অনেকটা। আকাশ প্রায় নীল, মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় সাদা রঙের মেঘ। যখন-তখন দু’-এক পশলা বৃষ্টি হলেও শরৎকাল এসে গিয়েছে বোঝা যায়। যদিও টিলার উপরে বাড়ি, তবু সামনের খানিকটা জায়গা সমতল। বড় বড় গাছ রয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। পাশের পাহাড়টা একেবারে ঘন সবুজ বনে ঢাকা। সমতল জায়গাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বিরাট গাছ। ঠিক দেওয়ালের মতো সেই দিকটা খাড়া নেমে গিয়েছে। পাছে কেউ হঠাৎ পড়ে না যায়, তাই আগেকার জমিদাররা এখানে অনেকটা পাঁচিল গেঁথে দিয়েছিলেন। সে-পাঁচিল অবশ্য এখন অনেকটাই ভাঙা।

দুটো হরিণ কাকাবাবুর ঘোড়ার সামনে দিয়ে জোরে দৌড়ে চলে গেল। একটা ময়ূরও দেখা গেল একটু পরে। এখনও এখানে কিছু কিছু বন্য প্রাণী আছে। একসময় বাঘও ছিল। মহা-ডাক্তার বলেছেন, কয়েকটা বাঘ মাঝে মাঝেই দেখা যায়। কাকাবাবু হরিণ আর ময়ূর দেখে খুশি হলেও মনে মনে ভাবলেন, বাঘটাঘ না দেখাই ভাল।

বেশ কিছুক্ষণ বেড়ানোর পর কাকাবাবু ফিরে এলেন বাড়িটায়। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। এই বাড়িটাকে সারিয়ে টারিয়ে একটা টুরিস্ট লজ কিংবা হোটেল বানাতে অনেক লোক এখানে এসে থাকতে পারে। কিন্তু তার আগে রাস্তা বানাতে হবে, জলের ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি লোকজন আসা-যাওয়া শুরু করলে হরিণ-ময়ূররাও আর থাকবে না।

এখানে তিনদিন কেটে গেল কাজের মধ্যে। সোমনাথ মন্দির নিয়ে বইটার ভূমিকা লিখতে গিয়ে ক্রমশই বড় হয়ে যাচ্ছে। এই কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আল্লস পাহাড়ে যাওয়া হল না! চমৎকার সুযোগ ছিল। সে জন্য একটু একটু মনখারাপ হয়। তখন জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। এখানকার পাহাড়ে বরফ জমে না বটে, কিন্তু অন্যরকম সুন্দর। কত বড় বড় গাছ। পাহাড়ের আড়ালে যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন মনে হয়, ওই দিকটাতেই যেন স্বর্গ। আর চার-পাঁচদিন কাটাতে পারলেই কাকাবাবুর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

আরও দু'দিন পর সকালবেলা কাকাবাবু ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আজকের বাতাসে একটু একটু ঠান্ডা ভাব। কাকাবাবু একবার ঘড়ি দেখলেন। ঘোড়াটা চলছে দুলকি চালে। কাকাবাবু নানারকম পাখির ডাক শুনতে শুনতে এগোচ্ছেন খাদের দিকে। ওখান থেকে উপত্যকা অনেক অনেক নীচে। তাকিয়ে থাকলে গা শিরশির করে, তবু দেখতে ভাল লাগে।

আর-একটা ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ শুনে কাকাবাবু ভাবলেন, যদু বুঝি ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসছে। যদুর যত্নের কোনও ত্রুটি নেই, প্রতিদিন তিন-চারবার জল এনে দেয়। রান্নাও বেশ ভাল।

কয়েকটা বড় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অন্য এক অশ্বারোহী। তার মুখে একটা কালো রঙের মুখোশ। কাকাবাবুর চিনতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র দেরি হল। এ তো সেই কর্নেল!

কাকাবাবু বললেন, “খুঁজে পেয়েছ জায়গাটা? আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।”

কর্নেল বলল, “খুঁজে পাওয়া এমন কী শক্ত ব্যাপার? আমি কালকেই এসে লক্ষ্য করছিলাম, তুমি কোনও পুলিশের ব্যবস্থা করেছ কিনা!”

কাকাবাবু বললেন, “সেই জন্যই এত দূরে এসেছি। এখানে কোনও পুলিশ আসবে না। অন্য কেউ আসবে না। তুমি মুখোশ পরেছ কেন?”

কর্নেল বলল, “বেশ করেছি। শোনো রায়চৌধুরী, আজই হবে শেষ ডুয়েল। দ্যাখো, আমি আড়াল থেকে কিংবা পিছন থেকে আক্রমণ করিনি। সামনাসামনি এসেছি। তুমি রেডি? আগেই ঠিক ছিল, যখন-তখন দেখা হয়ে যাবো।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, আমি রেডি।”

কর্নেল বলল, “এবারে অস্ত্র বেছে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। যার যেমন খুশি অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।”

কর্নেল আশ্তে আশ্তে কথা বলছিল, হঠাৎ চোঁচিয়ে বলল, “স্টাট।”

তারপরেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে একটা বোমা ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু পকেট থেকে রিভলভার বের করেও গুলি চালানোর সময় পেলেন না। বোমাটা এসে লাগল তাঁর গায়ে। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

লড়াইটা শুরু হতে না-হতেই শেষ।

কর্নেল ঘোড়া থেকে না নেমে অপেক্ষা করতে লাগল খানিকটা দূরে। যে-বোমাটা কাকাবাবুর গায়ে লেগেছে, সেটা একটা গ্যাস বোমা। সেটা থেকে এখনও গলগল করে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। বোমার আঘাতে নয়, গ্যাসেই জ্ঞান হারিয়েছেন কাকাবাবু।

ধোঁয়া শেষ হয়ে গেলে কর্নেল কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কাকাবাবুর কাছে। তাঁর নাকের কাছে হাত দিয়ে বুঝতে চাইল এখনও নিশ্বাস পড়ছে কিনা। পকেট থেকে বের করল নীল রঙের দড়ি। প্রথমে কাকাবাবুর দু’হাত, তারপর দু’পা, সারা শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল। ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ছিটিয়ে দিতে লাগল কাকাবাবুর মুখে।

একটু পরেই চোখ মেলে কাকাবাবু প্রথমে ভাবলেন, বৃষ্টি পড়ছে বুঝি। তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। তারপর পুরোপুরি চোখ মেলে দেখলেন, আকাশ। বৃষ্টি নেই। তাঁর মনে পড়ল, ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি পড়ে গিয়েছেন। সেই জন্যই কি জ্ঞান হারিয়েছেন? ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে টের পেলেন, তাঁর সারা শরীরে ব্যথা। হাত-পা বাঁধা। নড়াচড়ারও ক্ষমতা নেই।

সামনে দু’পা ফাঁক করে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল।

সে হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল, “রায়চৌধুরী, দ্যাখো, আমি ভদ্রলোক। সামনাসামনি ডুয়েল লড়ে তোমাকে হারিয়েছি।”

কাকাবাবু কোনওক্রমে বললেন, “তুমি ভদ্রলোকও নও, ইংরেজিও ভাল জানো না। ডুয়েল মানে বুঝি বোমা ছোড়া?”

কর্নেল বলল, “আর্মিতে আমার শার্প শুটার হিসেবে সুনাম ছিল। রিভলভার, বন্দুকে তুমি আমার সঙ্গে পারতে না। কিন্তু আমার ডান হাতটায় একটা চোট লেগেছে, কিছুদিন অস্ত্র ধরতে পারব না। তাই তোমাকে আগেই বলে নিয়েছি, যে-কোনও উপায়ে ...। আসলে তুমি কীভাবে মরবে, তা জানো না এখনও। তোমাকে আমি পাহাড়ের উপর থেকে খাদে ফেলে দেব। তুমি গড়াতে গড়াতে নামবে, সেটা আমি দেখব। পাথরে লেগে তোমার মাথাটা ছাতু হয়ে যাবে, হাত-পা ভেঙে একটা মাংসপিণ্ড হয়ে পড়বে নীচে। তাতে আমার গায়ের জ্বালা মিটবে।”

কাকাবাবুর নড়াচড়ার উপায় নেই। কর্নেল তাঁকে মাটি থেকে তুলে একটা ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল একটা আলুর বস্তার মতো। ঘোড়াটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল খাদের কাছে। সেখানে এসে আবার এক ধাক্কা

দিয়ে কাকাবাবুকে ফেলে দিল মাটিতে। ভাঙা দেওয়ালের এক জায়গায় কাকাবাবুকে টেনে এনে শুইয়ে দিল, কাকাবাবুর মাথাটা ঝুলে রইল খাদের দিকে।

সে কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে হিংস্র গলায় বলল, “রায়চৌধুরী, এই তোর শেষ মুহূর্ত। আর তোর বাঁচার কোনও উপায় আছে? ভগবানকে ডাকা” তার মুখটা কাকাবাবুর মুখের একেবারে কাছে। সে তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকচ্ছে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, “এই তো ভুল করলে! আমার এত কাছে আসা উচিত হয়নি। আমার আর-একটা অস্ত্রের কথা তুমি জানো না।”

কর্নেল বলল, “অস্ত্র? আর কী অস্ত্র!”

কাকাবাবু বললেন, “আমার চোখ। তাকাও চোখের দিকে। তুমি তো জগমোহন!”

চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে দারুণ অবাক হয়ে কর্নেল বলল, “হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি সব জানি। জগমোহন, তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো।”

কর্নেল বলল, “তুমি কি আমাকে হিপনোটাইজ ...” সে আর কথা শেষ করতে পারল না। তার চোখ বুজে এল। সে বসে পড়ল কাকাবাবুর পায়ের কাছে। তার খুতনিটা ঠেকে গেল বুকে।

এত সহজে যে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যাবে, কাকাবাবু আশাই করেননি। তিনি এবার ছটফট করতে লাগলেন। শরীরের বাঁধন খুলবেন কী করে? হাতও নাড়তে পারছেন না। বেশিক্ষণ কর্নেলের ঘোর থাকবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাকাবাবু নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে কর্নেল আবার জেগে উঠবে। যদুকে এখান থেকে চিৎকার করে ডাকলেও সে শুনতে পাবে না। তবু কাকাবাবু তাকে ডাকলেন দু’বার। কোনও লাভ হল না।

কাকাবাবু অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছেন। পাঁচ মিনিট পরেই কর্নেল আবার মাথাটা সোজা করল। আশ্তে আশ্তে বলল, “কী হল? আমার মাথা ঘুরছিল!”

সে আর-একবার কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, “তুমি জগমোহন? তুমি জগমোহন?”

কর্নেল বলল, “হ্যাঁ।”

কাকাবাবু এবার আদেশের সুরে বললেন, “জগমোহন, আমি যা বলব, তুমি তাই-ই শুনবে?”

কর্নেল বলল, “হ্যাঁ, শুনব।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাছে ছুরি আছে?”

কর্নেল বলল, “ছুরি? জানি না।”

কাকাবাবু বললেন, “দ্যাখো, তোমার পকেট খুঁজে দ্যাখো।”

কর্নেল সব পকেট খুঁজেও ছুরি পেল না। বুকপকেট থেকে বের করে আনল একতাড়া চাবি। সেই চাবির রিং-এ একটা ছোট্ট লাল রঙের ভাঁজ করা ছুরি।

কাকাবাবু আবার আদেশের সুরে বললেন, “জগমোহন, ওই ছুরি দিয়ে কাটো।”

কর্নেল বলল, “কী কাটব? গলা?”

কাকাবাবু বললেন, “না, ইডিয়েট। আমার গলা কাটতে বলিনি। বাঁধন কাটো। আগে হাতের।”

কাকাবাবুর গায়ের উপর ঝুঁকে কর্নেল দড়ি কাটতে শুরু করল। অত ছোট ছুরি দিয়ে শক্ত দড়ি কাটতে অনেক সময় লাগার কথা।

কাকাবাবু ধৈর্য ধরতে পারছেন না। তিনি জানেন, বেশিক্ষণ কর্নেলকে সম্মোহিত করে রাখা যাবে না। ওর জ্ঞান ফিরে এলেই বিপদ।

একটা রোবটের মতো আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে ছুরিটা দিয়ে দড়ি কাটছে কর্নেল। ছোট হলেও ছুরিটায় বেশ ধার আছে।

হঠাৎ একটু পরেই থেমে গিয়ে মাথা সোজা করল কর্নেল। এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার।

তারপর সে আপন মনে বলল, “এটা আমি কী করছি? রায়চৌধুরীর ফাঁদে পা দিয়েছি? ওই চোখ দিয়ে ও আসলে হিপনোটাইজ করছিল! ওর চোখ দুটো আমি গেলে দেব।”

সে কাকাবাবুর চোখ গেলে দেওয়ার জন্য ছুরি তুলল।

হাতের বাঁধন প্রায় কেটে এসেছিল, এবার জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারতেই ছিঁড়ে গেল। ঠিক সময়ে কর্নেলের ছুরি সমেত হাতটা ধরে ফেললেন কাকাবাবু।

শুয়ে থাকলে বেশি জোর পাওয়া যায় না, নইলে কাকাবাবুর হাতের জোর

সাংঘাতিক। কর্নেল প্রায় হাতটা নামিয়ে আনছে, কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে ওর নাকে একটা ঘুসি কষালেন। এত শক্তিশালী ঘুসি কর্নেল জীবনে খায়নি। সে আঁক করে আওয়াজ করে উঠল। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল তার নাক দিয়ে।

সেইটুকু সময়ের অমনোযোগেই কাকাবাবু ছুরিটা কেড়ে নিলেন ওর হাত থেকে। সেটা ওর গলায় ঠেকিয়ে বললেন, “ছোট হলেও এ-ছুরিটা তোমার গলা ফুটো করে দিতে পারবে।”

কর্নেল ঘেন্নার ভঙ্গি করে বলল, “এঃ, এত মারামারির পর শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটা ছুরি! কাটো দেখি আমার গলা। কাটো!”

কাকাবাবু সেই ধারালো ছুরিটা একবার বুলিয়ে দিলেন ওর গলায়। উপরের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

কর্নেল বলল, “ওসব আমি গ্রাহ্য করি না! এবার আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দেব। আর দেরি নয়!”

কাকাবাবুর মাথাটা খাদের দিকে ঝুলছে এখনও। জোরে ধাক্কা দিলেই তিনি গড়াতে শুরু করবেন। এইটুকু ছুরি দিয়ে কর্নেলকে ঘায়েল করা যাবে না, তিনি বুঝেছেন। তিনি উঠে বসতেও পারছেন না। কর্নেলেও তাকাচ্ছে না তাঁর চোখে চোখে।

সে কাকাবাবুকে ঠেলা শুরু করতেই কাকাবাবু প্রথমটা এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি আর পারছেন না। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শত্রুপক্ষকে অসাবধান করে দেওয়ার এটা একটা উপায়।

কর্নেল বলল, “পাঁচ গুনব, তুমি শেষ হয়ে যাবে, রায়চৌধুরী। এক, দুই...”

কাকাবাবু প্রাণপণে খানিকটা মাথা তুলে দু’হাতে চেপে ধরলেন কর্নেলের মাথা। ওর মাথা ধরেই তিনি উঠে বসলেন।

কর্নেল দারুণ চেষ্টা করে কাকাবাবুর দু’হাতের মুঠি থেকে নিজের মাথা ছাড়িয়ে নিতে গেল, পারল না। তখন সে-ও দু’হাতে টিপে ধরল কাকাবাবুর গলা। যেন দু’জন আদিম মানুষ। এখনও কোনও অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। এখনও হাত দিয়ে লড়াই করে। কাকাবাবুর এক পা খোঁড়া বলেই হাতে জোর বেশি। তিনি কর্নেলের মাথাটা কয়েক বার ঠুকে দিলেন পাশের পাঁচিলে। কয়েক বারের পর কর্নেলের হাত আলগা হয়ে এল। মাথায় অত আঘাতে তার জ্ঞান চলে গেল।

কাকাবাবু একটুক্ষণ হাঁপালেন জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে। তারপর নিজের সব বাঁধন খুলে কর্নেলকে বাঁধলেন।

একটু আগে যা ছিল, এখন ঠিক যেন তার উলটো হয়ে গেল।

কর্নেলের ঘোড়ার পিঠের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে কাকাবাবু প্রথমে নিজে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন, খানিকটা জল ঢেলে দিলেন কর্নেলের মুখে।

কর্নেল চোখ মেলে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, “এবার সত্যিই খেলা শেষ। তুমি আমাকে এই খাদে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছিলে, তাই না? এবারে দ্যাখো, আমি তোমাকে আরও কত কঠিন শাস্তি দেব। তুমি একটু একটু করে শেষ হয়ে যাবে।”

পা থেকে গলা পর্যন্ত দড়ি বাঁধা অবস্থায় কর্নেলকে কাকাবাবু শুইয়ে দিলেন ওরই ঘোড়ায়। তারপর বাড়িটার কাছে এসে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলেন একটা গাছের সঙ্গে।

যদুকে ডেকে তিনি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বললেন। ফিরে যেতে হবে।

মহা-ডাক্তার তো মহা অবাক। কোনও খবর না দিয়ে ফিরে এসেছেন কাকাবাবু, সঙ্গে একজন বন্দি!

কাকাবাবু বললেন, “একে রাখতে হবে মাটির তলার ঘরে। কী ব্যাপার পরে বলল। আজ আমার শরীর ও মনের উপর অনেক চাপ পড়েছে। আজ আমি তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ঘুমোব।”

ঘোড়া থেকে নামিয়ে কর্নেলকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সে কাতরভাবে বলল, “মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি হার মেনে নিচ্ছি। আমার অনুরোধ, একটা গুলি চালিয়ে আমাকে শেষ করে দাও। আমাকে আর অপমান করো না।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার অনুরোধ আমি শুনব কেন? তুমিও তো আমাকে গুলি করে মারার বদলে গড়িয়ে দিয়ে মারতে চেয়েছিলে। আমার চুলের মুঠি চেপে ধরেছিলে। আমি তোমাকে আপাতত একটা লোহার দরজা দেওয়া ঘরে আটকে রাখব জন্তুর মতো। অপমানই তোমার আসল শাস্তি।”

মাটির তলায় একটা ঘরের দরজা খুলে কর্নেলকে ছুড়ে দেওয়া হল।

পরদিন সকালবেলা কাকাবাবু অনেকটা সুস্থ, স্বাভাবিক বোধ করলেন। একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলে অসম্ভব চাপ পড়ে মনের উপর। কয়েকদিন ভাল করে নিশ্বাসও ফেলতে কষ্ট হয়।

কফি খেতে খেতে কাকাবাবু মহা-ডাক্তারকে কর্নেলের সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শোনার পর মহা-ডাক্তার বললেন, “ছি ছি ছি ছি। আপনি আমাকে আগে কেন বলেননি, যদি উলটো কিছু হয়ে যেত! এ তো সাংঘাতিক লোক! এত গোঁয়ার। আপনি ওর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী নন, তবু আপনাকে মারবেই মারবে! রাজাবাবু, এখন এই লোকটাকে নিয়ে কী করবেন? ওকে তো পুলিশের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত!”

কাকাবাবু বললেন, “পুলিশের হাতে দিলে অনেক কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। ওর ঠিক শাস্তি হবে না। ওর শাস্তি আমিই দেব। এখন ওই ঘরেই ও থাকবে। কেউ যেন ওর সঙ্গে কোনও কথা না বলে।”

দুপুরবেলা মহা-ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, “রাজাবাবু, আপনার বন্দিকে কিছু খাবার দিতে হবে তো? কী দেব?”

কাকাবাবু বললেন, “খাবার দিতেও পারো, না দিতেও পারো। একই কথা।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “সে কী, সব জেলখানাতেই বন্দিদের খাবার দেয়!”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি কয়েকখানা রুটি-তরকারি দিয়ে দেখতে পারো। বোধহয় খাবে না। ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ো। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। কেউ যেন কোনও উত্তর না দেয়। আমি কয়েকদিন ওর মুখ দেখতেও চাই না।”

পরদিন মহা-ডাক্তার বললেন, “খাবার দেওয়া হয়েছিল, ও তো কিছুই খায়নি। দিনের পর-দিন যদি না খেয়ে থাকে, কতদিন ওকে আটকে রাখবেন? আমারও যে একটা দায়িত্ব এসে যাচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার তো কোনও দায়িত্ব নেই। ও যদি কিছু না খেয়ে মরেই যায়, তা হলে তো ভালই হয়। ওকে আমরা মারধর করছি না, ওকে ছুরি দিয়ে কিংবা গুলি করে মারছি না। ও না খেয়ে মরলে কিন্তু আমাদের কোনও দোষ হবে না। পুলিশ কিছুই বলবে না।”

মহা-ডাক্তার কাচুমাচুভাবে বললেন, “আপনি সত্যিই ওকে না খাইয়ে মারতে চান?”

কাকাবাবু বললেন, “ইয়েস! চিড়িয়াখানার একটা জন্তুকে কিছু না খেতে দিলে যেমন হয়, ওর ঠিক সেই অবস্থা হবে।”

সস্তুর সঙ্গে একদিন টেলিফোনে কথা হল। সস্তুর পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। জোজোকে নিয়ে সে বেড়াতে আসতে চায়, ডাক্তার অনুমতি দিয়েছে। কাকাবাবু সেই ডাক্তারকেও ফোন করলেন। সত্যি, তাঁর আপত্তি নেই।

দু’ দিনের মধ্যে এসে গেল সন্তু আর জোজো।

এতদিন কর্নেলের গল্প কিছুই বলেননি ওদের। এবার কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, যা, নীচে গিয়ে একটা লোককে দেখে আয়। সে তোকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি তার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছি।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, তোমাকে একটা খবর জানানো হয়নি। আমার সেই ব্যথাটা একদম সেরে গিয়েছে। এখন আমি লাফাতে পারি। দৌড়োতেও পারি।”

জোজো বলল, “আমি উড়তে পারি!”

মাটির তলায় বন্দি কর্নেলকে দেখে এসে সন্তু করুণভাবে বলল, “কাকাবাবু, সত্যিই লোকটা না খেয়ে মরে যাবে?”

কাকাবাবু বললেন, “মরুক না, তাতে ক্ষতি কী। ওরকম মানুষরা না বাঁচলে কী হয়?”

জোজো বলল, “শুধু মাটির নীচে নয়, ওকে নরকে পাঠানো দরকার।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “মুশকিল কী জানো, সন্তুবাবু, আমি চুপিচুপি লোকটাকে ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম। রাজাবাবুকে কিছু না জানিয়ে। কিন্তু ছেড়ে দিলে তো ও আবার তোমার কাকাবাবুকে মারবার চেষ্টা করবে। ও তো ছাড়বে না।”

কাকাবাবু একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, “এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে সন্কে হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং চা আর মুড়ি-তেলেভাজা খেতে খেতে গল্প করা যাক। ভোপালে এবার কী হল, তা তো তোদের বলিনি।”

মহা-ডাক্তার বললেন, “এগারো দিন হয়ে গেল। লোকটা কিছু খায়নি। ভাবতেই কেমন লাগছে।”

সন্তু জিঞ্জেস করল, “না খেয়ে মানুষ কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?”

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, “একদিনও না। মানে, আমি বাঁচব না।”

কাকাবাবু বললেন, “যতীন দাস নামে একজন বিপ্লবী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তিনি জেলের মধ্যে অনশন করেছিলেন। মারা যান বাষট্টি না তেষট্টি দিন পর।”

সন্তু করুণ মুখ করে বলল, “মানুষটা সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে যাবে? আমাদের চোখের সামনে? ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওই লোকটা তোকে খুন করার জন্য গুলি করেছিল। তোর প্রায় বাঁচায় আশা ছিল না। তবু তুই ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছিস?”

সন্তু বলল, “ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। কাকাবাবু, তুমি এবার ওকে ছেড়ে দাও!”

জোজো বলল, “ছেড়ে দিলেই তো ও আবার কাকাবাবুর মারার চেষ্টা করবে যে!”

কাকাবাবু রাগে গরগর করে বললেন, “নাঃ, আমি আর ওর বদমায়েশি সহ্য করব না! এবার ওকে আমি শেষ করে দেবই দেব! ওর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই!”

তারপর কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখে বললেন, “চলো। উপরে বসি। কাল সকালে আমি লোকটাকে চরম শাস্তি দেব।”

পরদিন সকালে কাকাবাবু নামলেন মাটির নীচে। যদুকে দিয়ে এক গেলাস লেবু-চিনির শরবত বানিয়ে নিয়েছেন হাতে।

এই বারো দিন কর্নেল যে শুধু কিছু খায়নি, তা নয়। বোধহয় একদিনও ঘুমোয়নি। এরই মধ্যে রোগা হয়ে গিয়েছে বেশ। চোখের নীচে কালি।

মেঝেতে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “রায়চৌধুরী, প্লিজ, প্লিজ, আমাকে গুলি করে মারো। এভাবে মেরো না।”

কাকাবাবু বললেন, “এই শরবতটা খেয়ে নাও।”

কর্নেল ঘৃণার সঙ্গে বলল, “শরবত! আমার হাতে দিলে ছুড়ে ফেলে দেব। তোমাদের কোনও কিছু আমি খাব না।”

কাকাবাবু বললেন, “এতদিন খাওনি। আজ খেলে ক্ষতি নেই। অনশন

ভাঙার সময় প্রথম এই শরবত খেতে হয়। অন্য কিছু খেলে বমি হয়ে যায়।”

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বলল, “কেন, আজ খেলে ক্ষতি নেই কেন? আজ কোনও পুজোর দিন? আমি ওসব মানি না।”

কাকাবাবু ঘড়ি পরা হাতটা ওর মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “এটা দ্যাখো।”

কাকাবাবুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে সে বলল, “আমি ঘড়ি দেখে কী করব? সময় জেনে আমার কী হবে?”

কাকাবাবু বললেন, “ঘড়িতে সময় ছাড়া অন্য জিনিসও দেখা যায়। তারিখ দেখা যায়। দ্যাখো, আজ কত তারিখ। তেরো। এটা কোন মাস!”

কর্নেল বলল, “জানি না। আমার সব গুলিয়ে গিয়েছে।”

কাকাবাবু বললেন, “অক্টোবর মাস। আর ক’দিন পরেই পুজো। শোনো কর্নেল, তেরো অক্টোবর মানে কী? ছ’মাস আগে আমাদের ডেথ-ডেথ খেলা শুরু হয়েছিল। সেটা কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি বলেছিলে, তুমি জেন্টলম্যান। ছ’মাস কেটে গেলে আর কেউ কারও শত্রু থাকব না। ঠিক কিনা?”

দারুণ অবাক হয়ে কর্নেল বলল, “ছ’মাস শেষ হয়ে গেল?”

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, “এটা পড়ে দ্যাখো। তোমার বাবা একজনকে খুন করে জেল খেটেছিলেন। সে-ও প্রতিশোধের ব্যাপার ছিল। তুমিও সেই একই কারণে আমাকে মারতে এসেছিলে। অথচ তুমি জানতেও পারোনি, আর্মিতে থাকার সময় তোমার ভাই নষ্ট হয়ে যায়। স্মাগলিং, ডাকাতিও করেছে।”

কাগজটা পড়তে পড়তে কর্নেল অবিশ্বাসের সুরে বলল, “সত্যি তাই? আমার ভাইয়ের এই অবস্থা হয়েছিল?”

কাকাবাবু বললেন, “এসব পুলিশ রেকর্ডে আছে। এই ধরনের ক্রিমিনালরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মরে। নাও, কর্নেল, শরবতটা খেয়ে ফেলো। তুমি এখন থেকে নতুনভাবে জীবন শুরু করো।”

এবার আর আপত্তি করল না সে। এক চুমুকে খেয়ে ফেলল শরবত। তারপর কাকাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, “আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।”

কাকাবাবু তাকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

সন্ত, জোজোরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার তারা হাততালি দিয়ে উঠল।



E-BOOK